গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৪ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ৯ - ১৫ ডিসেম্বর, ২০১১ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

পদযাত্রায় সোচ্চার ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকরা

পাশ-ফেল তুলে দেওয়া চলবে না

রাজ্য সরকার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তে রাজ্যের মানুষ বিস্মিত, ব্যথিত শুধু নয়, চূড়ান্ত আশাহত। সিপিএম ক্ষমতায় বসেই প্রাথমিক স্তর থেকে পাশ-ফেল ও ইংরেজি তুলে দিয়েছিল। এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে সরকার ইংরেজি পুনরায় চালু করলেও পাশ-ফেল চালু করেনি। রাজ্যের মানুষের গভীর বিশ্বাস ছিল, তৃণমূলের নেতৃত্বে নতুন সরকার পাশ-ফেল চালু করবে। তার পরিবর্তে সরকার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিল। আশাহত মানুষ সরকারের এই বিশ্বাসভঙ্গে প্রবল ক্ষুব্ধ। এই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটল ১ ডিসেম্বর মহানগরীর রাজপথে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে এ দিন ১০ হাজার ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সহ সাধারণ মানুষ সামিল হলেন এক পদযাত্রায়। সর্বনাশা কেন্দ্রীয় শিক্ষা আইন এ রাজ্যে প্রয়োগ না করার দাবিতে তোলা বলিষ্ঠ স্লোগানে মুখরিত হল রাজপথ।

কলেজ স্কোয়ারে আধুনিক শিক্ষার রূপকার ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করার মধ্য দিয়ে এই পদযাত্রার সূচনা হয়। অংশ নিতে ছাত্র শিক্ষকরা এসেছিলেন স্কুল কলেজ থেকে, অভিভাবকরা এসেছিলেন তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ রেখে, কৃষক এসেছিলেন ধানকাটার কাজ ফেলে। একদিন কাজ না করলে ঘরে হাঁড়ি চড়বে না জেনেও খেতমজুর, শ্রমিকরা এসেছিলেন সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। মায়েরাও এসেছিলেন, মিছিলে পা মেলাতে। সঙ্গে এনেছিলেন স্কুল পড়ুয়া সন্তানদের। সকলের একটাই সংকল্প, গরিবের ঘর থেকে শিক্ষার আলো কেড়ে নিতে দেব না।

কলেজ স্কোয়ার থেকে দেশপ্রিয় পার্ক, দীর্ঘ পথ ধরে এগিয়েছে পদযাত্রা। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে অগণিত মানুষ। সংবাদমাধ্যম প্রচার করে মিছিল দেখলে মানুষ বিরক্ত হয়। অথচ এই মিছিলে আটকে পড়া ভিড়ের মধ্য থেকে একটিও বিরক্তির কথা শোনা গেল না। বরং সর্বত্রই শোনা গেছে, আলোচনা — পাশ-ফেল তুলে দিলে কতখানি সর্বনাশ হবে তা নিয়ে। মিছিলের জেরে যানজটের কথাই যখন সংবাদমাধ্যমের প্রচারের মূল প্রতিপাদ্য, তখন আটকে থাকা বাসের মধ্য থেকেই আসছে মন্তব্য — 'এই প্রতিবাদটা খুব দরকার ছিল।' দাবি আদায়ের জন্য যে মূল্য দিতে হয় তা মানুষের অজানা নয়। কোনও দাবিকে মানুষ যখন একান্ত ভাবে নিজের বলে মনে করে তখন সেই মূল্য দিতে

সাতের পাতায় দেখুন

১ ডিসেম্বরের পদযাত্রা। কলেজ স্কোয়ার থেকে দেশপ্রিয় পার্ক। পুরোভাগে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সহ নেতৃবৃন্দ।

'কী আমাদের অপরাধ যে গুলি করে হত্যা করা হল?'

মগরাহাট

'বাবু, আমরা বিদ্যুৎ, রাস্তা আর খাবার পানিটুকু চেয়েছিলাম, বদলে পেলাম গুলি। দুটো তাজা প্রাণ চলে গেল।' মগরাহাটের নৈনান গ্রামে ঢুকতেই দুটি সদ্য খোঁড়া কবর দেখিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন আবদুরভাই। ৩ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল গ্রামের নিহত-আহতদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে এই কথাগুলিই শুনলেন।

১ ডিসেম্বর গুলিচালনার পরদিনই এস ইউ সি আই (সি) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রতন মুখার্জীর নেতৃত্বে যে প্রতিনিধি দল নৈনান গ্রামে ছুটে গিয়েছিলেন, তাদের কাছেও গ্রামের মানুষ এই ধরনের দুঃখের কথা জানিয়েছিলেন। বিডিও সহ পঞ্চায়েত সভাপতিকে কথা বলার জন্য অনেকবার ডাকলেও তিনি আসেননি, দাবি মানা তো দূরের কথা। পুলিশ এমন বেপরোয়া গুলি চালিয়ে মানুষ মারবে, একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি গ্রামবাসী সাধারণ মানুষ।

নৈনানের চারদিক ঘেরা যে ছোট্ট মাঠটাতে পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি চালিয়েছে, তার এক দিকে অনাথ মুসলিম ছাত্রদের থাকার একতলা একটি বাড়ি বা এতিম খানা আর অন্য দিকে দোতলা মাদ্রাসা। পুলিশের ভয়ঙ্কর লাঠিচার্জের পর ঐ ছোট্ট জায়গাটুকু একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। তারপর পুলিশ গুলি চালাতে শুরু করে। ওখানকার মানুষ

ছয়ের পাতায় দেখুন

দোকানদার, কর্মচারী, কৃষক-মজুর, সাধারণ মানুষের

সর্বনাশের নীল নকশা

খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি

কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার মাল্টি ব্র্যান্ড রিটেলে (একটা দোকানে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের খুচরো ব্যবসা) ৫১ শতাংশ ও সিঙ্গল ব্র্যান্ড রিটেলে ১০০ শতাংশ (একটা দোকানে একটামাত্র পণ্যের খুচরো ব্যবসা) বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের ছাড়পত্র দিয়েছে। ওরা আশা করছে, এর ফলে আগামী পাঁচ বছরে দেশের খুচরো ব্যবসায় আরও ৭০ হাজার কোটি টাকা বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ হবে। সরকারের বক্তব্য, এর ফলে পরিবেশ ক্ষেত্রের যথেষ্ট উন্নতি হবে, অধিক পরিমাণে কৃষিপণ্য সংরক্ষণ করা যাবে, কৃষকরা ফসলের লাভজনক দাম পাবে, ক্ষুদ্র উৎপাদনে তেজি ভাব আসবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে, মুদ্রাস্ফীতির উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা যাবে। এক কথায়, এই নীতি কার্যকর হলে, দেশের আম জনতার উন্নতির দরজা খুলে যাবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী পরিষদের এই ঘোষণায় দেশি-বিদেশি পুঁজির কর্তারা উল্লসিত। দু'হাত তুলে এই নীতিকে তারা সমর্থন করেছে। কে নেই এই সমর্থকদের তালিকায়? ওয়ালমার্ট ইন্ডিয়ার রাজ জৈন, ভারতী এন্টারপ্রাইজের রাজন মিত্তাল, রিলায়েন্সের মুকেশ আম্বানি — সবাই এই নীতিতে উল্লাস প্রকাশ করেছে। উল্লাস প্রকাশ করেছে আমেরিকার সবচেয়ে বড় খুচরো ব্যবসায়ী সংস্থা ওয়ালমার্ট। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তারা বলেছে, 'ভারত সরকার, এই প্রথম খুচরো ব্যবসায়

চারের পাতায় দেখুন

ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনের সমর্থনে

ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনের সমর্থনে ২৭ নভেম্বর কলকাতার মহাবোধী সোসাইটি হলে এ আই ডি ওয়াই ও আয়োজিত আলোচনা সভায় এই আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। শেষে ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনের উপর একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়।

আন্দোলনের চাপে সার ডিস্ট্রিবিউটরের লাইসেন্স বাতিল

কৃষকদের লাগাতার আন্দোলনের চাপে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর থানার আমতলা হাটের সার ডিস্ট্রিবিউটর জনার্দন পাডুইয়ের লাইসেন্স বাতিল করতে বাধ্য হল কৃষিবিভাগ। এস ইউ সি আই (সি) দীর্ঘদিন ধরে সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে চাষিদের সংগঠিত করে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। ২১ সেপ্টেম্বর বজবজ ২নং ব্লকে কৃষি আধিকারিককে সার, বীজ ও কীটনাশকের কালোবাজারির প্রতিবাদে পাঁচ শতাধিক কৃষক কৃষি অধিকর্তাকে ঘেরাও করেন। কৃষি অধিকর্তা চাষিদের দাবি মেনে ডিলারদের মিটিং ডাকেন এবং এম আর পি রেটে পাকা চালান সহ সার, বীজ, কীটনাশক বিক্রির জন্য নির্দেশ দেন। ডিস্ট্রিবিউটর জনার্দন পাডুইয়ের বিরুদ্ধে ডিলাররা অভিযোগ করেন যে, বেশি দাম না দিলে তার কাছ থেকে সার, বীজ, কীটনাশক পাওয়া যায় না। সেদিনই বজবজ ২নং বিডিও এবং এডিও-র পক্ষ থেকে নজরদারি করার আশ্বাস দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, ২১ নভেম্বর এস ইউ সি আই (সি) বাওয়ালি সাতগাছিয়া লোকাল কমিটির সদস্য, বজবজ ২নং ব্লকের বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ এবং কৃষি দপ্তরের স্থায়ী সদস্য কমরেড বাসুদেব কাবড়ী সার কিনতে গেলে ডিস্ট্রিবিউটর সরকারি রেটে তা দিতে অস্বীকার করে এবং বস্তা পিছু ৫০ টাকা থেকে ২৩০ টাকা পর্যন্ত বেশি দাম চায়। সার পরিবহনের জন্য রোড চালান দিলেও পাকা রসিদ দিতে অস্বীকার করে এবং বাসুদেব কাবড়ীকে মাফিয়া দিয়ে ঘিরে ফেলে। তিনি কোনক্রমে ডিস্ট্রিবিউটর-এর দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বিষ্ণুপুর ২নং ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তাকে অভিযোগ জানান। পরে ওই ডিস্ট্রিবিউটরের লাইসেন্স বাতিল করা হয়।

স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ টাকা খরচ হয়নি

আন্দোলনে জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি

বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন ব্লকে স্বাস্থ্য খাতে ৪ কোটি ২৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা অর্থাৎ বরাদ্দ টাকার ৭৯ শতাংশ এখনও খরচ না করে ফেলে রাখা হয়েছে। এর প্রতিবাদে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে ২৫ নভেম্বর সিএমওএইচ-এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এ ছাড়া সমস্ত শূন্যপদে ডাক্তার, নার্স, অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, সাপে কাটা, কুকুরে কামড়ানোর প্রতিষেধক বিনামূল্যে সরবরাহ, পিপিপি নীতি বাতিল করা, গ্রামীণ চিকিৎসকদের বিজ্ঞানভিত্তিক ট্রেনিং দিয়ে উপযুক্ত সাম্মানিকের বিনিময়ে স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে নিয়োগ করা এবং সম্প্রসারিত হাসপাতালগুলিকে দ্রুত চালু করার দাবি জানানো হয়। মিছিল শুরুর আগে মাচানতলার মোড়ে এক সভায় বক্তব্য রাখেন গৌতম মাহাত, জেলা সম্পাদিকা লক্ষ্মী সরকার প্রমুখ। কর্তৃপক্ষ দাবিগুলি সম্পর্কে ইতিবাচক ভূমিকা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

পাশ-ফেল চালুর দাবিতে ছত্তিশগড়ে ছাত্র বিক্ষোভ

ছত্তিশগড়ের দুর্‌গ শহরের সায়েন্স কলেজ, সুরানা কলেজ, কল্যাণ কলেজ, ভগৎ সিং স্কুল, নবীন স্কুল, ন্যাশানাল স্কুল ও আদর্শ গার্লস স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি জমা দেন দুর্‌গ-এর ডেপুটি কালেক্টরেট রানু সাহুর কাছে। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়েছে, শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও ব্যবসায়ীকরণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, যশপাল কমিটির সুপারিশ, ন্যাশনাল নলেজ কমিশন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বিল, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বিল অবিলম্বে বাতিল এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা পুনরায় চালু করতে হবে। ২২ নভেম্বর সায়েন্স কলেজ থেকে কয়েক শত ছাত্রছাত্রীর মিছিল শহর পরিক্রমা করে ডেপুটি কালেক্টরেটের অফিসের সামনে পৌঁছায়। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সভায় বিভিন্ন কলেজের প্রতিনিধিরা গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের থেকে শিক্ষা কেড়ে নেওয়ার সরকারি নীতির তীব্র নিন্দা করে বক্তব্য রাখেন। ডেপুটি কালেক্টরেট ছাত্র প্রতিনিধিদের জানান, স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সমগ্র কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কমরেড মহেন্দ্র কুমার সাহু ও কমরেড ঘনশ্যাম পটেল।

অজানা জ্বর মোকাবিলার দাবিতে ডেপুটেশন

অজানা জ্বর, ম্যালেরিয়া, চিকনগুনিয়া প্রভৃতি রোগ প্রায় মহামারীর আকার ধারণ করেছে। ৩০ নভেম্বর কলকাতা কর্পোরেশনের ৩৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের হাতে এ বিষয়ে এলাকার মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র তুলে দেয় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) মানিকতলা কলেজ স্ট্রিট লোকাল কমিটির পক্ষে এক প্রতিনিধিদল। প্রথমে দাবিপত্র নিতে অস্বীকার করলেও পরে পৌরমাতা সাধারণ মানুষের ক্ষোভের কথা বুঝতে পেরে দাবিপত্র নিতে বাধ্য হন। অজানা জ্বর বা অন্যান্য রোগের বিস্তার ও পানীয় জলের অপ্রতুলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তিনি কোনও সদুত্তর দিতে না পেরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তারবাবুর সঙ্গে প্রতিনিধিদলের দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। তিনি ওয়ার্ডের ক্লিনিকে উপযুক্ত চিকিৎসা পরিকাঠামোর অভাবের কথা স্বীকার করেন এবং উচ্চ পর্যায়ে তা জানাবেন বলে কথা দেন। স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রশ্নে, সাধারণ মানুষের কাছে ডাক্তারি পরামর্শ পৌঁছে দেওয়ার জন্য অটো প্রচার ও প্রচারপত্র বিলি করার আশ্বাসও দেন তাঁরা। প্রতিনিধিদলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের লোকাল কমিটির সদস্য কমরেডস জয়ন্তী ঘাঁটা, মনীশ চক্রবর্তী, নারায়ণ রবিদাস, রুমা পণ্ডা ও এলাকার নাগরিকবৃন্দ।

পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন দত্ত আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২২ নভেম্বর শিলিগুড়ির নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল ক্লিনিকে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

ষাটের দশকে প্রয়াত কমরেড সুব্রত চৌধুরীর মাধ্যমে কমরেড স্বপন দত্ত সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করেন। তিনি এ আই ডি এস ও-র রাজ্য কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে তিনি এস ইউ সি আই (সি) দলের নেতৃত্বে গরিব চাষি, বর্গাদার ও খেতমজুরদের নানাবিধ দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করেন। এলাকার খাস ও বেনাম জমি উদ্ধারে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রণী। তৎকালীন খাদ্য আন্দোলনে, ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশে মুক্তি আন্দোলনের সময়ে শরণার্থীদের রান্না করা খাবার দেওয়া সহ নানারকম সাহায্যে তিনি এগিয়ে আসেন। যুবকদের নিয়ে গড়ে তোলেন একটি ‘যুব সংঘ’। শরণার্থী শিবিরগুলোতে খাদ্য বস্ত্র বন্টনে এই যুব সংঘ দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুললে তিনি কারারুদ্ধ হন। কারারুদ্ধ অবস্থাতেই নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে বন্দিদের নিয়ে তিনি আন্দোলন সংগঠিত করেন। হলদিবাড়ি ব্লক সহ মেখলিগঞ্জ মহকুমার নানা স্থানে সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধির জন্য তিনি কষ্টসাধ্য সংগ্রাম করেছিলেন। সদাহাস্যময় এই কমরেড ছিলেন সকলের প্রিয়জন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদে কোচবিহার জেলার পার্টিকর্মী সমর্থক দরদীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। দলে দলে হলদিবাড়ি পার্টি কার্যালয়ে তাঁরা জমায়েত হন। তাঁর মরদেহ হলদিবাড়ি পার্টি অফিসে পৌঁছালে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। দলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড তপন ভৌমিক, রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্য কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য, ক মরেড জয়দেব মণ্ডল, কোচবিহার জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার, কমরেড শংকর গাঙ্গুলী, কমরেড কাজল চক্রবর্তী সহ জেলার নেতৃবৃন্দ এবং উপস্থিত কর্মী-সমর্থকবৃন্দ। দলের বিভিন্ন গণসংগঠনের পাশাপাশি রেড ক্রসের পক্ষে শ্রী অসিত রক্ষিত, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী প্রাণেশ্বর মৈত্র ও হলদিবাড়ি পৌরসভার কর্মচারীবৃন্দ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। এছাড়া শিলিগুড়ি নার্সিং হোমে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান দার্জিলিং জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য, কমরেড তন্ময় দত্ত, কমরেড শংকর পাল সহ অনেকে।

কমরেড স্বপন দত্তের মরদেহ নিয়ে শোকমিছিল শহর পরিক্রমা করে। হলদিবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। বহু ব্যবসায়ী শোকমিছিলে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসায়ী সমিতির নানা পদে থাকায় এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সম্পাদক থাকায়, ২৪ নভেম্বর হলদিবাড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতি সমস্ত দোকান-পাট চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ রেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

কমরেড স্বপন দত্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একদিনের জন্য দলীয় কার্যালয়ে রক্তপতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন নির্ভীক বিপ্লবী সংগঠককে।

কমরেড স্বপন দত্ত লাল সেলাম

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

নদীয়া জেলা এ আই ডি এস ও-র প্রথম জেলা সম্পাদক কমরেড শ্যামল রায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গত ২৫ অক্টোবর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। ১৯৭৩ সালে দলের বর্তমান জেলা সম্পাদক কমরেড মৃণাল দত্তের মাধ্যমে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র সাথে তিনি যুক্ত হন।

১৩ নভেম্বর দলের জেলা অফিস পার্শ্বস্থ মাঠে প্রয়াত কমরেডের স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমরেড শ্যামল রায়ের ছবিতে মাল্যদান করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস ও কমরেড সুজিত ভট্টশালী, জেলা সম্পাদক কমরেড মৃণাল দত্ত, জেলা গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ তাঁর আত্মীয়স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীরা।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের পর প্রয়াত কমরেডের প্রতি শ্রদ্ধায় ১ মিনিট নীরবতা পালিত হয়। প্রধান বক্তা এ আই ডি এস ও-র তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস প্রয়াত কমরেডের অমায়িক ব্যবহার, সদাহাস্যময় মুখ এবং কংগ্রেস আমলের দাপটের বিরুদ্ধে সাহসিকতা নিয়ে পার্টির কাজ চালিয়ে যাওয়া প্রভৃতি গুণের কথা উল্লেখ করেন। কিশোর বয়সে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পরিবেশে ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার জন্য কমরেড শ্যামল রায়ের সাহসী উদ্যোগ কৃষ্ণনগরে সে সময় ছাত্র-যুবদের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিল। বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে এই দিকটি প্রধান বক্তা নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন। সাংসারিক প্রয়োজনে অনেকদিন পার্টির কাজে যুক্ত থাকতে না পারলেও মনটা তাঁর থাকত সবসময় পার্টির জন্য। মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভের কাজ করাকালীন তাঁর সহকর্মীদেরও দলের সাথে কীভাবে যুক্ত করা যায়, তার জন্য মাঝে মাঝে নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করতেন। তিনি পাড়া থেকে তাড়ির ভাটিখানা সরিয়ে সেখানেই দলের জেলা অফিস গড়ে তুলেছিলেন। এলাকায় সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য ‘অগ্নিবীণা’ সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে তুলে শরৎ-নজরুল-রবীন্দ্রনাথ সহ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনীচর্চার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

সভার সভাপতি রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুজিত ভট্টশালী বলেন, রুচিশীল গান-নাটক-আবৃত্তি-হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে সবসময় শ্যামল অন্যান্য কমরেডদের মাতিয়ে রাখতেন। যারা নতুন সংগঠনে যুক্ত হত সবাই তাঁর সান্নিধ্যে থাকার আকর্ষণ অনুভব করত। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কমল দত্ত। আন্তর্জাতিক সংগীতের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

কমরেড শ্যামল রায় লাল সেলাম

ঋণের ফাঁসে কৃষকের আত্মহত্যা প্রশাসন আগের মতোই মানতে নারাজ

১৫ নভেম্বর বর্ধমান শহরের কাছেই চাণ্ডুল গ্রামের চাষি ভবানী পোড়েল ঋণের ফাঁস থেকে বেরোতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে জীবনের জ্বালা মিটিয়েছেন। ১৮ নভেম্বর ঐ জেলারই ভাতার থানার কালিটিকুরি গ্রামের সফর মোল্লা ধার শোধ করার কোনও পথ না পেয়ে বিষ খেয়ে নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের শস্যগোলা বর্ধমান জেলার এই দুই কৃষকই এবার ঋণ নিয়ে চাষ করেছিলেন। দু'জনের মধ্যে আরও একটি মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। ভবানী পোড়েলের মৃত্যু নিয়ে বর্ধমানের জেলাশাসক ওঙ্কার সিং মিনা বলেছেন, 'ওনার বাড়িতে কোনও ধানই মজুত ছিল না, পারিবারিক কারণেই এই আত্মহত্যা। সফর মোল্লার মৃত্যুর বিষয়ে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেছেন, 'ছেলেটি মদ খেয়েছিল এবং মায়ের সাথে ঝামেলা হয়। তারই জেরে এই আত্মহত্যা।' অর্থাৎ ঋণের জালে দিশাহারা চাষির আত্মহত্যা ঘটলেই সরকারি কর্তারা যা বলে থাকেন, এ তারই হুবহু পুনরাবৃত্তি।

ভবানী পোড়েল ঋণ নিয়ে আলু চাষ করে হিমঘরে রেখেছিলেন। দাম পাননি। সফর মোল্লা বোরো মরশুমে সাত বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছিলেন ৮০ হাজার টাকা ঋণ করে। তাঁর মা জানিয়েছেন, বাড়িতে ১৮০ বস্তা ধান মজুত। বিক্রি করার উপায় না পেয়েই সফর এই পথ বেছে নিয়েছে। ভাতারের চাষি সফর মোল্লার প্রতিবেশী এবং আত্মীয় শেখ নুরুল ইসলাম, জিয়ারুল মোল্লা সকলেরই ঘরে ধান জমে আছে। রাইস মিলগুলির গেটে সরকারি সহায়ক মূল্য লেখা বিজ্ঞাপনও ঝুলছে। কিন্তু ৪০০ রাইস মিলের অধিকাংশই বন্ধ। সরকার ধান কেনার দায়িত্ব দিয়েছে রাইস মিলগুলিকেই। তারা গেট বন্ধ করে বসে আছে চাষির অভাবি বিক্রির অপেক্ষায়। যতটুকু ধান কিনছে তার দাম দেওয়া নিয়ে অসংখ্য নিয়ম, যার বেড়াজালে চাষির পক্ষে ধান বিক্রি করা অসম্ভব। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিল, চেকের মাধ্যমে দাম দেওয়া হবে। রাজ্যের মুখ্য সচিব বলে দিয়েছেন, ব্যাঙ্ক জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট খুলে দেবে। এদিকে ব্যাঙ্ক যা কাগজপত্র চাইছে, তা দিতে চাষির কালঘাম ছুটছে। শেষ পর্যন্ত ১০ কুইন্টাল পর্যন্ত ধানের ক্ষেত্রে নগদ টাকা দেওয়ার কথা মন্ত্রী বলেছেন। এবার রাইস মিলের বক্তব্য, আমাদের নগদ টাকার জোগান নেই। মিল মালিকরা স্বাভাবিকভাবেই আড়তদারদের পক্ষে। তাই তাঁরা যুক্তি তুলছেন, আড়তদাররা চাষির থেকে ধান কিনে মিলে বিক্রি করলে তাদের টাকা পরে শোধ করা যায়। ফলে চাষির থেকে কেনার বদলে আড়তদারের থেকে ধান কেনা মিলমালিকের পক্ষে বেশি সুবিধাজনক। সরকারি পরিকল্পনা — অত্যাবশ্যক পণ্য নিগমের এজেন্ট হিসাবে রাইস মিলগুলিকেই নিয়োগ করা হবে। তারা নিগমের সঙ্গে চুক্তি করবে এবং চুক্তিতে উল্লেখিত পরিমাণ ধানের আগাম দাম তারা নিগমকে জমা দেবে। নিগমের অ্যাকাউন্টে ঐ টাকা জমা হলে চাষির নামে অ্যাকাউন্ট-পেয়ি চেক কাটবে নিগম। কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম হল সমবায় সংস্থাগুলি। এই সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে হাজার টাকার ফর্ম কিনে স্ট্যাম্প পেপারে চুক্তি করলেই চলবে। তারা চাষির থেকে ধান কিনতে পারবে। এই নিয়মের সুযোগে মিল মালিকরা রাতারাতি সমবায় খুলে ফেলেছেন। ব্যাঙ্ক থেকে চাষিকে দেওয়ার জন্য সমবায়-ঋণ নিয়ে তাঁরা সেই টাকা অবাধে অন্য ব্যবসায় খাটাচ্ছেন। চাষির থেকে ধান কেনার কোনও উদ্যোগই তাঁদের নেই।

সরকারি সংস্থা বেনফেড এবং কনফেড গ্রামে

চাষির গোলায় গত বোরো মরশুমের ধান, মাঠে না কাটা অবস্থায় পড়ে আমন ধান, অথচ বাজারে চালের দাম আগুন।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ধান কেনা এখনও শুরুই করেনি। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। বোরো ধান কাটা হয়েছে এপ্রিল-মে মাসে। আজও তা চাষির ঘরে পড়ে আছে। অথচ বাইরের রাজ্য থেকে আসা চাল এ রাজ্যের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। বোরো ধানে সার, বীজ, সেচের জল বেশি লাগে বলে চাষের খরচও বেশি। সফর মোল্লার প্রতিবেশী নুরুল ইসলাম ঐ গ্রামের তৃণমূল মনোনীত পঞ্চায়েত সদস্য। তাঁর হিসাব — বীজ, সার, কীটনাশক, পাওয়ার টিলার ভাড়া, পাম্পের ভাড়া এবং তেল, ধান বোনা, নিড়ানো এবং কাটার মজুরি বাবদ বিঘাতে খরচ হয় ৫,৫০০ টাকা। বিঘাতে গড়ে ১০ বস্তা (৬০ কেজি বস্তা) ধরলে খরচ বস্তাপিছু ৫৫০ টাকা। কিন্তু রাইস মিল গেট বন্ধ করে বসে আছে, ফলে গ্রামে ফড়েরা ধান কিনছে ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকায়। মিলে ধান নিয়ে গেলে কুইন্টাল পিছু খরচ ৩০-৪০ টাকা, এর সাথে দুজন মজুরের মজুরি ২০০ টাকা অতিরিক্ত খরচ। সরকারি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বস্তা পিছু — মোটা ধানে ৬৪৮ টাকা, সরু ধানে ৬৬৫ টাকা অর্থাৎ কুইন্টাল পিছু যথাক্রমে ১০৮০ টাকা ও ১১০০ টাকা। রাইস মিল প্রতি কুইন্টালে ১০ থেকে ১৩ কেজি অপুষ্ট ধান ও ধুলোর অজুহাতে বাদ দিয়ে দিচ্ছে। ফলে সরকারি ন্যূনতম মূল্য যাঁরা পাচ্ছেন তাঁদেরও পড়তায় পোষাচ্ছে না। চাষির ঘরে বোরো ধানই জমে আছে। আমন ধান কাটার মজুরি খরচ করার মতো টাকা চাষির হাতে নেই। হুগলির সহকারী কৃষি অধিকর্তা আবার বোরো ধান চাষ করার জন্যই চাষিদের দোষারোপ করেছেন। এ আজব দেশে সরকারি কর্তারা ধান চাষ করাটা এখন চাষিদের দোষ বলে চিহ্নিত করে! তার ফলও ফলছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, দেশে চালের উৎপাদন বিগত দশ বছরে ২.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। চাষির গোলায় গত বোরো মরশুমের ধান, মাঠে না কাটা অবস্থায় পড়ে আমন ধান, অথচ বাজারে চালের দাম আগুন। সরকার বিপিএল তালিকাভুক্তদের দেওয়ার জন্য চাল পাচ্ছে না। অন্ত্যোদয় প্রকল্পের চাল মিলছে না।

মন্ত্রী বলছেন, ১৫ ডিসেম্বর থেকে সরকার ধান কিনবে। তাঁরা জানেন, চাষির পক্ষে এতদিন ধান ধরে রাখা সম্ভব নয়। তাহলে অভাবি বিক্রি, ঘরে ঘরে অনশন, আত্মহত্যা — এ কি চলতেই থাকবে? না কি বিনপুরের দহিজুড়িতে যেমন করে বৃদ্ধ কৃষক সেখ ইনসাফ অন্ত্যোদয়ের চাল না পেয়ে খাদ্যমন্ত্রীর গাড়ি আটকে দাঁড়িয়েছিলেন সেই পথই চাষিরা বেছে নেবেন সংগঠিতভাবে? *(সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৩-১১-২০১১, আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭, ২০, ২২, ২৪, ২৫-১১-২০১১, বর্তমান ২০-১১-২০১১)*

বর্ধমানে কৃষক আত্মহত্যা প্রসঙ্গে এ আই কে কে এম এস-এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড পঞ্চানন প্রধান এক বিবৃতিতে বলেন, ধান বিক্রি করতে না পেরে ঋণের দায়ে তিন জন চাষি যে ভাবে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন, তা সভ্যতার লজ্জা। রাজ্য সরকারের খাদ্যমন্ত্রী যে ভাবে এই সব কৃষকের চরিত্রে কালিমা লেপন করার চেষ্টা করেছেন, আমরা তার তীব্র নিন্দা করি। দাবি জানাই, এই কৃষক পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং কৃষকদের ধান-পাট বিক্রির উপযুক্ত ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে।

কিযেনজির 'মৃত্যু' বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে দিল

২৪ নভেম্বর জঙ্গলমহলে নিহত মাওবাদী নেতা কোটেশ্বর রাও ওরফে কিষেনজি মুখোমুখি সংঘর্ষে মারা গেছেন, নাকি যৌথবাহিনী তাঁকে হত্যা করেছে, নানা মহল থেকে এই প্রশ্ন উঠছে। এমন সন্দেহের কারণও আছে। প্রথমত, কিষেনজির গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ বুড়িশোলের যে জায়গায় দেখানো হয়েছে সেটা ঘন জঙ্গল নয়। তা ছাড়া কিষেনজিকে ঘিরে তাঁর দেহরক্ষীরা যে নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে রাখত বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে, সেই নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে যৌথবাহিনীর গুলিতে শুধু কিষেনজিই মারা গেলেন, তাঁর কোনও দেহরক্ষীর গায়ে আঁচড়টিও লাগল না — যুক্তির বিচারে এর বিশ্বাসযোগ্যতা কতটুকু?

দ্বিতীয়ত, জঙ্গলের মধ্যে এক জওয়ানকে উদ্ধৃত করে জনৈক সাংবাদিক লিখেছেন, পাশ থেকে আর এক জওয়ান বললেন, 'আমাদের দিক থেকে প্রায় ১০০০ রাউন্ড ফায়ারিং হয়েছে। ওরাও কম যায়নি।' যদি ধরে নেওয়া হয় দুপক্ষের মধ্যে প্রবল গুলি বিনিময় হয়েছে, তা হলে প্রশ্ন, গুলিতে যৌথবাহিনীর কোনও জওয়ান বা পুলিশ নিহত বা আহত হলেন না কেন? মারা গেলেন কেবল এক পক্ষের, তাও মাত্র একজন? তাহলে সত্যিই কি সংঘর্ষ হয়েছিল? নাকি প্রশাসনের বয়ানে পুরো ঘটনা সাজানো?

তৃতীয়ত, পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সংঘর্ষে জখম হয়েছেন সুচিত্রা মাহাত। সেই সুচিত্রা মাহাত কোথায় আজও পুলিশ তার হদিশ দিতে পারেনি। পুলিশ বলেছে, পালানোর সময় এ কে ৪৭ রাইফেলটি তিনি কিষেনজির দেহের পাশে ফেলে যান। সন্দেহ দানা বাঁধে এখানেও। যৌথবাহিনী যাকে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হতে দেখল এবং সেই ব্যক্তি যে সুচিত্রা মাহাত তা পরিষ্কার চিনতে পারল এবং শরীরের কোন অংশে গুলি লাগল তাও দেখল, তখন বোঝাই যায় দূরত্ব বেশি ছিল না। তা হলে নাগালের মধ্যে পেয়েও যৌথবাহিনী কেন তাকে গ্রেপ্তার করল না? তাদের ঘেরাটোপ থেকে দু'মাসের বাচ্চা কোলে নিয়ে সুচিত্রা নিরাপদ স্থানে চলে গেলেন — এটা অনেকটা বাজারি সিনেমার গল্পের মত নয় কি?

চতুর্থত, ২৪ নভেম্বর কিষেনজির মৃত্যুর পর দিল্লি থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রথম প্রতিক্রিয়ায় পুলিশকে বলেন, 'কিষেনজিকে জীবিত ধরতে চেয়েছিলাম, মারলেন কেন?' তারপর ২৭ নভেম্বর বেহালার চৌরাস্তায় এক নির্বাচনী সভায় তিনি বললেন, ঘটনার (এনকাউন্টার) কথা তিনি জেনেছেন সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে। তারপর তিনি পুলিশকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'তোমরা কী আত্মসমর্পণের সুযোগ দাওনি?' পুলিশ জানিয়েছে, ''আত্মসমর্পণের জন্য তিনদিন সময় দেওয়া হয়েছিল। মাইকে পুলিশ বারবার এ কথা বলেছে। পুলিশ ব্যবস্থা করেছিল সেফ প্যাসেজ দিতে। ওরা শোনেনি। প্রথম গুলি ওরাই চালিয়েছে।'' রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব বলেছেন, তিনি ঘটনার কথা জানতেন। প্রশ্ন হল, তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানালেন না কেন? এতবড় একটি ঘটনা ঘটে গেল, স্বরাষ্ট্র দপ্তর মুখ্যমন্ত্রীকে কিছু জানাল না — এতো গুরুতর গাফিলতি, যার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দুঃসাধ্য। পুলিশ, প্রশাসন, রাজ্যের আই বি, জেলা আই বি কেউ কিছু মুখ্যমন্ত্রীকে জানাল না, মুখ্যমন্ত্রীকে জানতে হল সাংবাদিকদের থেকে, তা হলে এই সব আমলাদের পিছনে বিপুল অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন কী — এ প্রশ্নও উঠছে।

তা ছাড়া যৌথবাহিনীর রণকৌশল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহল জানেন, তারা হানা দেয় অতর্কিতে। ফলে মাইক বাজানো এবং তিনদিন সময় দেওয়া কথাটির পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে তারা অতর্কিতে হানা দেয়নি, কিষেনজি তাদের হাতের নাগালে ছিল। এ অবস্থায় অর্থাৎ আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বিশাল বাহিনীর ঘেরাটোপে থেকে হঠাৎ আগে গুলি চালাবার রণকৌশল কোনও অভিজ্ঞ যোদ্ধা নেবে না। ফলে, 'কিষেনজিই আগে গুলি চালান', পুলিশের এই যুক্তি সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। এই অভিযানকে 'ভেরি ক্লিন অ্যান্ড সাকসেসফুল অপারেশন' বলেছেন সিআরপির ডিরেক্টর জেনারেল বিজয়কুমার। তিনি বলেছেন, 'আমার ছেলেরা এক মুহূর্ত দেরি করেনি।' এ কথাটার তো একটাই অর্থ নিশানার মধ্যে আসামাত্র টার্গেটকে গুলি করা হয়েছে। তা হলে তিনদিন সময় দেওয়া, সেফ প্যাসেজ দেওয়া — এসব বিবৃতির বাস্তবতা কিছু থাকে কি?

তাঁর শরীরে ২০টি আঘাতের চিহ্ন সম্পর্কে অনেকে অভিযোগ তুলেছেন যে, তাঁকে আগেই ধরে প্রবল অত্যাচার চালানোর প্রমাণ ঐ চিহ্নগুলি। সবটাই অত্যন্ত রহস্যজনক।

বেহালার জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ''ওদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা সেই প্রস্তাবে কর্ণপাত করেননি। উল্টে ১ হাজার রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল মাওবাদীরা। পুলিশ যদি সংযত না থাকত, তাহলে আরও ৫০০ মানুষ খুন হয়ে যেত'' (বর্তমান, ২৮-১১)। অপারেশনে যুক্ত এক জওয়ানের ইতিপূর্বে উদ্ধৃত বক্তব্যে বলা হয়, যৌথবাহিনী ১ হাজার রাউন্ড ফায়ারিং করেছে। যার ঠিক উল্টো বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কোনটা সঠিক? প্রশাসনের বিবৃতি অনুযায়ী সংঘর্ষ হয়েছে ২০ মিনিট। মাওবাদীরা সংখ্যায় ছিল 'জনাচারেক।' এই পরিস্থিতিতে উভয়পক্ষের মোট ২ হাজার গুলি চালানোর তথ্যগুলো কেমন রহস্যজনক নয় কি?

কিষেনজির মৃত্যুর এই 'সময়টি' ও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এমন একটা সময়ে এই ঘটনা ঘটল যখন রাজ্য সরকার একদিকে বলেছে শান্তিপূর্ণ পথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তারা সমস্যার সমাধান চায়, আবার অন্যদিকে যৌথবাহিনীর সশস্ত্র অভিযানও চালানো হচ্ছিল। এস ইউ সি আই (সি) -র বক্তব্য ছিল, গরিব আদিবাসী ও সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত ও সন্ত্রস্ত করে সশস্ত্র সামরিক অভিযান চালিয়ে এই ধরনের একটি গুরুতর সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আরও বলা হয়েছিল, জঙ্গলমহলের জনগণের আন্দোলনের মঞ্চ হিসেবে গঠিত 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি'র নেতা ছত্রধর মাহাতোর সঙ্গে আলোচনায় বসে সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। পাশাপাশি পৃথকভাবে তথাকথিত মাওবাদীদের সঙ্গেও আলোচনা চালানো দরকার। অস্ত্রশক্তি দিয়ে এই সংকটের সমাধান করা যাবে না। এ কথাও বলা হয়েছিল যে, কংগ্রেস ও সিপিএম এই সমস্যাকে জিইয়ে রেখে নিজ নিজ নিকৃষ্ট স্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছে। এ কারণে সে সময়ই প্রশ্ন উঠেছিল, আদিবাসী জনগণের সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান উপেক্ষা করাই কি রাষ্ট্রের অভিসন্ধি? তথাকথিত মাওবাদী সমস্যা কি তবে রাষ্ট্রের পক্ষে ফলদায়ক? কেউ কেউ তো এ কথাও বলছেন যে, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খন্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের যে অফুরন্ত খনিজ সম্ভার রয়েছে তা বহুজাতিক কোম্পানিগুলির লুণ্ঠনের সুবিধার্থে, স্থানীয় জনগণের আন্দোলন স্তব্ধ করতে যৌথবাহিনীর উপস্থিতি দরকার এবং সেই কারণে তথাকথিত মাওবাদী সমস্যার উপস্থিতিও পুঁজির সেবাদাস রাষ্ট্রের প্রয়োজন। এ কথা রাজ্যের মানুষের জানা যে, অন্ধ্রপ্রদেশে যখন মাওবাদী সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনার প্রক্রিয়া চলছিল সেই সময়ই মাওবাদী নেতা আজাদ খুন হন। এই হত্যা নিয়েও তখন একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল। তৎকালীন বিরোধী নেত্রী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সেদিন নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করেছিলেন।

এইভাবে মাওবাদী নেতা কিষেনজির মৃত্যুকে ঘিরে যে রহস্যময়তা সৃষ্টি হয়েছে ও নানা প্রশ্ন উঠেছে, তা নিরসনের জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত জরুরি। অভিযুক্ত কোনও ব্যক্তি বা রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করে আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তাঁর পরিণতি স্থির করাটাই গণতন্ত্রসম্মত। কিন্তু কিষেনজির ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠেছে, তাঁকে গ্রেফতার করার পর ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছে, এই অভিযোগ গুরুতর ও গণতন্ত্রের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। এ জন্যই এস ইউ সি আই (সি)র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ২৭ নভেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে — সুপ্রিম কোর্টের কোনও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে বিচারবিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে দু-মাসের মধ্যে সত্য প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে।

খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি

একের পাতার পর

একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল'। নীতির এই পরিবর্তনকে 'শুভসূচনা' বলেছেন ভারত-মার্কিন বিজনেস কাউন্সিলের সভাপতি — রন সমারস। দেখা যাচ্ছে, এই নীতি দেশের ও বিদেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলিকে খুশি করেছে। তাই এই নীতির পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য তারা কোমর বেঁধে আসরে নেমে পড়েছে।

দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা কিন্তু আতঙ্কিত। তাঁদের সংগঠন, সারা ভারত ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন এই নীতির তীব্র বিরোধিতা করে ১ ডিসেম্বর সারা ভারতে ব্যবসা বনধ সফল করেছে। তাঁরা বলছেন — 'এই নীতি প্রমাণ করছে সরকার দেশীয় কর্পোরেট সংস্থা ও বহুজাতিক পুঁজির অনুরক্ত। ওদের হিসাব মতে, খুচরা ব্যবসায় দেশীয় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের ফলে ইতিমধ্যেই তারা ৩০ শতাংশ বাজার হারিয়েছে। এর পর বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটলে সমূহ সর্বনাশ হবে।' ভোটের বাজারে এই লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ীর প্রভাবের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন ভোটবাজ পার্টি সংসদে এই নীতির বিরোধিতা করছে। বিভিন্ন রাজ্যে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে বহুজাতিক পুঁজির সাথে এদের সখ্যতা, এই বিরোধিতার আন্তরিকতা সম্পর্কে চিন্তাশীল মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি না করে পারে না। বিশেষ করে বিজেপির বিরোধিতা তো হাস্যকর। কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতায় থাকার সময় ওরাই খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের প্রস্তাব তুলেছিল। তখন প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়ে সে প্রস্তাব ওরা কার্যকর করতে পারেনি। এবার জনগণের প্রবল বিক্ষোভ ও আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার প্রশ্নকে মাথায় রেখে ওরা বিরোধিতার খেলায় নেমেছে।

মূল আলোচনায় ঢোকার আগে দেশের খুচরো ব্যবসার বর্তমান অবস্থার দিকে একটু চোখ ফেরানো যাক। ২০০৪-'০৫ সালে দেশে খুচরো ব্যবসায় পণ্য বিক্রি হয়েছে ৪,৩৩,৯৬৩ কোটি টাকা। ২০০৯-১০-এ তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৭,৯৯,৪৭০ কোটি টাকা। এই ব্যবসার ২৩.২ শতাংশ ছিল সংগঠিত খুচরো ব্যবসায়ী অর্থাৎ বৃহৎ পুঁজির হাতে। ৭৬.৮ শতাংশ ছিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের হাতে। এই ব্যবসায়ীর সংখ্যা দেড়কোটির কাছাকাছি। কৃষির পর এই ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি মানুষ কাজ করে। দেশের মোট শ্রমিকের ৭.২ শতাংশ এই ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত। যাদের সংখ্যা কম-বেশি ৪ কোটি। দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৮.২ শতাংশ আসে এখান থেকে। দেশি-বিদেশি বহুজাতিক পুঁজি হিসাব কষে দেখেছে, খুচরো ব্যবসার এই বিশাল বাজার ২০২০ নাগাদ প্রায় সাড়ে চার গুণ বৃদ্ধি পাবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিদেশি পুঁজির একটা বড় অংশই এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হবে।

১ ডিসেম্বর। পাটনায় বিক্ষোভ।

বিশাল এই বাজার দখল করার দিকে দেশি-বিদেশি পুঁজির চোখ বহু দিন থেকেই। ২০০৫ সালে দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিদের সংগঠন ফিকি এবং আই সি আই সি আই যৌথভাবে এক সুপারিশপত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেছিল। এই স্মারকপত্রের মুখ্য বক্তব্য ছিল — (১) খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করবে। তার ফলে শিল্পে প্রাণসঞ্চার হবে, (২) এতে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও উন্নয়নশীল দেশ — উভয়েরই লাভ হবে, (৩) এর ফলে খুচরো ব্যবসারও বিকাশ ঘটবে, জাতীয় অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

সুপারিশপত্রে আরও বলা হয়েছিল, এই লক্ষ্য অর্জনে যা করা দরকার তা হল — (১) বাধাহীনভাবে খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজিবিনিয়োগ, (২) জোগানের ক্ষেত্রে সমস্ত বাধা নিষেধের অপসারণ, (৩) ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষিত ক্ষেত্র তুলে দেওয়া, (৪) বিপণনের বাধাগুলো দূর করা, (৫) রিয়েল এস্টেট ব্যবসার জন্য বাজার সংগঠিত করা।

এখানে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ করলে তাদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারতীয় বহুজাতিক খুচরো ব্যবসায়ীরাও বিদেশের বাজারে ঢুকতে পারবে। তাদের সম্পদের পাহাড় আরও স্ফীত হবে। প্রশ্ন হল তাতে দেশের সাধারণ মানুষের কী?

লক্ষ করলেই দেখা যাবে, এই সমস্ত সুপারিশই কেন্দ্রীয় সরকার ধীরে ধীরে কার্যকর করেছে। রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সম্প্রসারণে সমস্ত বাধা দূর করা হয়েছে, ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষিত সমস্ত ক্ষেত্রই প্রায় তুলে দেওয়া হয়েছে। যতটুকু আছে তাও ক্ষুদ্র শিল্পের সংজ্ঞা ও পরিধি বিস্তৃত করে বড় বড় মালিকদের হাতে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। বিপণনের ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে পরিগণিত ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের বিক্রয় কর কাঠামোকে প্রায় তুলে দিয়ে ভ্যাট চালু করা হয়েছে এবং যোগানের বাধা দূর করার নামে যতটুকু সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল, বিভিন্ন সেক্টরে তাও তুলে দিয়ে বহুজাতিক পুঁজিকে উপঢৌকন দেওয়া হয়েছে। রাসায়নিক 'সার' ক্ষেত্র এর বড় উদাহরণ। সিঙ্গল ব্র্যান্ড পণ্যের ক্ষেত্রে তখন (২০০৬ সালে) ৫১ শতাংশ বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। বাকি ছিল মাল্টি ব্র্যান্ড রিটেলে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা। সেটাও করে দেবার চেষ্টা হচ্ছে এবার।

খুচরো ব্যবসার বিপণনের সাথে সরাসরি যুক্ত সাড়ে পাঁচ কোটি পরিবার। যাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে এই খুচরো ব্যবসা, তাদের মধ্যে রয়েছে প্রায় ১২ কোটি মধ্য-নিম্ন-প্রান্তিক কৃষক সহ অন্যান্য ক্ষুদ্র উৎপাদকেরা। এই সাড়ে সতেরো কোটি পরিবার অর্থাৎ ৮০-৮৫ কোটি মানুষের জীবনে কী বার্তা নিয়ে আসবে এই নয়া নীতি? কী ধরনের ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে তাদের জন্য?

উত্তরে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলছেন — 'উদ্বেগ অবান্তর'। অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বলছেন — 'এতে উন্নয়নের সিংহদুয়ার খুলে যাবে'। ভয় এখানেই। প্রণববাবু, মনমোহন সিংদের উন্নয়ন আর আম জনতার 'উন্নয়ন' যে এক বস্তু নয়! নয়া নীতিগ্রহণের পর দেশে কোটিপতির সংখ্যা বেড়েছে অনেক, দেশীয় বহুজাতিক পুঁজি বিদেশে আরও বেশি বেশি পুঁজি রপ্তানি করছে। টাটা কিনেছে ব্রিটেনের কোরাস কোম্পানি, রিলায়েন্সের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হচ্ছে এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকা এমনকী ইউরোপেও; কিন্তু একই সময়ে দেশের ৭০ ভাগ মানুষ বাস করছে দারিদ্রসীমার নীচে, অপুষ্টিতে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা আফ্রিকা মহাদেশের সমান, আড়াই লক্ষের বেশি কৃষক আত্মহত্যার বেদনাদায়ক পথগ্রহণে বাধ্য হয়েছে, বিশ্বের বেকার বাহিনীর ৩০ শতাংশ মানুষ বাস করে ভারতে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান-শিশুমৃত্যু এই সব হিসাবে ধরলে মানব উন্নয়নের নিরিখে এ দেশের স্থান ১৩৪তম। কী বৈপরীত্য! একদিকে সম্পদের পাহাড় অন্যদিকে ভয়াবহ দারিদ্র্য-বঞ্চনার করুণ কাহিনী। এই হল ওদের উন্নয়নের চেহারা। তাই ওদের মুখে যখন উন্নয়নের কথা শোনা যায় — স্বাভাবিকভাবেই বুকটা কেঁপে ওঠে সাধারণ মানুষের। তাঁরা ভাবতে থাকেন, আবার কী দুর্দৈব নেমে আসবে তাঁদের জীবনে।

তাই খুচরো ব্যবসায় যখন বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের অবাধ ব্যবস্থা করে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার, স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক গ্রাস করছে তাঁদের। এই আতঙ্ক যে অমূলক নয়, তা বোঝা যায় যখন আমরা ২০০৯ সালে বাণিজ্য ক্ষেত্রের সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির ৯০তম রিপোর্টের দিকে চোখ রাখি। সেই রিপোর্টে সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি পরিষ্কার বলেছিল — (১) খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগে ছাঁটাই অনিবার্য। (২) বড় বড় খুচরো ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যমূলক দাম নির্ধারণ নীতির ফলে ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঝাঁপ বন্ধ করতে বাধ্য হবে। (৩) বর্তমানের পণ্য প্রচলনের যে ব্যবস্থা আছে তা ভেঙে খান খান হয়ে যাবে। ফলে পণ্য ক্রয় ও বিক্রি উভয় ক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির কর্তৃত্ব কায়েম হবে। (৪) আর এর ফলে মানুষের আর্থিক জীবনে বিপর্যয় ঘটবে।

শুধু সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি কেন, পূর্বে উল্লেখিত ফিকির রিপোর্টেও বলা হয়েছে — ''manufacturing sector in India must be developed to address the dislocation of existing retailers'', অর্থাৎ উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া বর্তমানের খুচরো ব্যবসায়ীদের সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের শিল্পক্ষেত্রকে আরও বিকশিত হতে হবে। এর অর্থ কী? উচ্ছেদ নিশ্চিত। এই উচ্ছেদ কী পরিমাণ হবে তার মোটামুটি একটা হিসাবও দিয়ে দিয়েছে ওরা, 'The rate of closer of unorganised retail shops in gross terms was found to be 4.2 per cent per annum,' (Source : I C R I E R studies on impact of organised Retailing on the Unorganised Sector, 2008) এর অর্থ হল প্রতি বছর সাড়ে ছয় লক্ষ দোকান বন্ধ হবে। পনেরো বছর এই প্রক্রিয়া চালাতে পারলেই তো পোয়াবারো। খুচরো ব্যবসায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের আর প্রায় অস্তিত্ব থাকবে না। খুচরো ব্যবসার পুরো বাজারই প্রায় চলে আসবে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির হাতে। বাস্তব এই ভয়ংকর সম্ভাবনাকে কি মনমোহন সিং বা প্রণববাবুদের মুখের আশ্বাসে উড়িয়ে দেওয়া যায়?

নিজেদের বক্তব্য সপ্রমাণ করার জন্য কংগ্রেসী নেতা মন্ত্রীরা চীনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছেন। বলছেন, চীন তো এই নীতি গ্রহণ করেছে ১৯৯২ সালে। কই খুচরো ব্যবসায় তো কোনও দোকান সেখানে বন্ধ হয়নি? বরং দোকানের সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে কর্মরত মানুষের সংখ্যাও। তা হলে? ওদের এই যুক্তি বিভ্রান্তিকর, অসত্য। প্রথমে মনে রাখতে হবে, চীনের বর্তমান পণ্য বিপণনের পরিকাঠামো, তা পাইকারি বা খুচরো যাই হোক, গড়ে উঠেছে সমাজতন্ত্রের আমলে। বর্তমানে চীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হলেও পণ্য বিপণনের সাবেক এই প্রক্রিয়াটাকে ওরা এখনও চালু রেখেছে। অর্থাৎ চীনে খুচরা ব্যবসাও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ও রাষ্ট্রীয় পুঁজির দ্বারা পরিপুষ্ট। ফলে, সেখানে রাষ্ট্র বন্ধ না করে দিলে বিদেশি পুঁজির সাথে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে ব্যবসা বন্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ভারতের ক্ষুদ্র খুচরো ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে কি এই রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা পাওয়া যাবে? যাবে না। তাদের ফেলে দেওয়া হবে দেশি-বিদেশি হাঙরদের সামনে। ফল কী হবে সহজেই অনুমেয়। তাই চীনের উদাহরণ দিয়ে ভারতের পরিস্থিতি ব্যাখ্যার চেষ্টা অযৌক্তিক। ওঁরা যদি সৎ হতেন, তাহলে বরং থাইল্যান্ডের উদাহরণ দিতে পারতেন। এই দেশটি ১৯৯৭ সালে খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজির ঢালাও বিনিয়োগের সুযোগ করে দিয়েছিল। কী ফল হয়েছে তাতে? কী ধরনের উন্নয়ন হয়েছে সেখানে? ''Within a short span of time, the foreign players expanded their operation significantly and marginalised the local retailers. Many local players had to close down their business''. (Discussion paper on foreign direct investment in Multi-Brand Retail Trading, Govt.of India, 2010, page-15) কী পেলাম আমরা? বিদেশি পুঁজি ঢুকতে দেওয়ার ফলে খুচরো ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। আর আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির। এই উন্নয়নই হয়েছে থাইল্যান্ডবাসীর। এখানেও সেই সর্বনাশ আমরা ডেকে আনতে চাইব?

১ ডিসেম্বর সারা ভারত ব্যবসা বনধের সমর্থনে কটকে বিক্ষোভ

কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রী ও তাদের দোসররা বলতে পারেন কোথায় থাইল্যান্ড আর কোথায় ভারত! ভারত এখন বিশ্বশক্তি। এশিয়ায় চীনের প্রতিদ্বন্দ্বী। দুনিয়ায় বহু দেশে পুঁজি রপ্তানি করছে ভারত। সুতরাং ভয় কী? বিদেশি পুঁজি আসুক। তার সাথে প্রতিযোগিতা করে ভারতের পুঁজি আরও যোগ্য হয়ে উঠবে। সুতরাং বিদেশি পুঁজির আগমনে যারা 'গেল গেল' রব তুলছেন তাদের চিন্তা অমূলক। দ্বিতীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কোনও সম্ভাবনাই নেই এখানে।

এদের যুক্তি আমাদের জানা। আমরা জানি, ভারতের বহুজাতিক পুঁজি তাদের নিজেদের শ্রেণী স্বার্থেই বিদেশি পুঁজি ডেকে আনছে এবং ক্রমাগত আনবেও। খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের দরজা খুলে দেওয়ার পিছনেও ওদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা কাজ করছে। খোলাখুলি সে কথা বলছেও ওরা। 'Allowing FDI in Joint ventures is likely to provide access for domestic suppliers to international retailing' (Source, Discusssion paper on foreign Direct investment in Multi-Brand Retail Trading, P-9) অর্থাৎ লেনদেনের ব্যাপার। এখানে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ করলে তাদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারতীয় বহুজাতিক খুচরো

পাঁচের পাতায় দেখুন

জনস্বাস্থ্য রক্ষার আন্দোলনকে তীব্র করুন

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সম্মেলনের আহ্বান

চিকিৎসা পরিষেবা যখন মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, দু'বেলা ভাতের সংস্থান করতে না পারলেও যেখানে বহুমূল্য ওষুধ ও যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার বন্দোবস্ত করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে বহু পরিবার, তখন কেন্দ্র-রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি মালিকদের মুনাফা করার সুযোগ পাইয়ে দিচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিণত হচ্ছে উচ্চ মুনাফার ব্যবসায়। এরকম পরিস্থিতিতেও সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার অধিকারের দাবিতে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন, সেই চিকিৎসক-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের (এম এস সি) পঞ্চম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে। ১২-১৪ নভেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারকানাথ কোটনিস হলে (শতবার্ষিকী হল) ১৫টি রাজ্য ও ২টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে সহস্রাধিক প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ, ব্যবসায়ীকরণ এবং সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের (পিপিপি) নামে সরকারি পরিষেবাকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া, সাড়ে তিন বছরের মেডিকেল কোর্স এবং ভিশন ২০১৫, ওষুধের দাম বৃদ্ধিতে সরকারের নীরবতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নিষিদ্ধ ও জাল ওষুধ তৈরি, ওষুধ পাচার বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর হামলা এবং পরিকাঠামো ও পরিষেবার নিম্নমানের জন্য ডাক্তার-নার্সদের বলির পাঁঠা করার সরকারি ষড়যন্ত্র এবং মেডিকেল এথিক্সের অবনমনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের দাবিও উত্থাপন করা হয়।

১২ নভেম্বর, প্রকাশ্য অধিবেশনে পতাকা উত্তোলন করেন কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং সংগঠনের সহ সভাপতি অধ্যাপক অসীম কুমার রায়চৌধুরী। তিনি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের পথিকৃৎদের স্মরণবেদি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহতদের স্মারক বেদিতে মাল্যার্পণ করেন। স্বনামধন্য শিক্ষক ও চিকিৎসক অধ্যাপক সুকুমার মুখার্জী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে আশঙ্কা প্রকাশ করেন, সাড়ে তিন বছরের কোর্সের মাধ্যমে ডাক্তার তৈরি করার পরিকল্পনা মানুষের মধ্যে বিভাজন আনবে এবং গ্রামীণ মানুষ যথার্থ চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। তিনি বলেন, ডাক্তাররা গ্রামে যেতে অনিচ্ছুক নন। স্বাধীনতার সময় থেকে উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবই মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা। বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সংবর্ধনা কমিটির চেয়ারম্যান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস, ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির সদস্য ডঃ মুজফফর আহমেদ। বিশিষ্ট সমাজসেবী মেধা পাটকর নন্দীগ্রামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে ক্ষতিগ্রস্তদের শুশ্রূষায় মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের অবদানের কথা স্মরণ করে বার্তা পাঠান। 'কারেন্ট ক্রাইসিস ইন মেডিকেল এডুকেশন ঃ এক্সপেরিমেন্ট অব ভিশন ২০১৫, বি আর এইচ সি অ্যান্ড আদার্স' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন নিউ দিল্লির মৌলানা আজাদ মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের ডিরেক্টর প্রফেসর ম্রদুল কুমার দাগা এবং আই এম এ-র জয়েন্ট সেক্রেটারি ডঃ নরেন্দর সাইনি।

১২ নভেম্বর, চারটি অধিবেশনে স্বাস্থ্যের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন ক্যালকাটা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের পূর্বতন ডাইরেক্টর অধ্যাপক মনীশ এস চক্রবর্তী, দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের মলিকিউলার মেডিসিনের অধ্যাপক দীপঙ্কর ঘোষ প্রমুখ। ১৩ নভেম্বর 'বেসরকারিকরণ, ব্যবসায়ীকরণ ও পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ নীতি' শীর্ষক এক আলোচনা-সভায় চেয়ারম্যান সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল জনমুখী স্বাস্থ্যনীতি, স্বাস্থ্যের গণতান্ত্রিক অধিকার ও জিডিপি-র ন্যূনতম ১০ শতাংশ স্বাস্থ্যে বরাদ্দ করার জোরালো দাবি জানান। তিনি সারা দেশ জুড়ে স্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে কটক মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও নিউরোসার্জারি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সনাতন রথকে সভাপতি এবং ডাঃ বিজ্ঞান বেরাকে সম্পাদক করে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়।

মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

উপস্থিত প্রতিনিধিদের একাংশ

খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি

চারের পাতার পর

ব্যবসায়ীরাও বিদেশের বাজারে ঢুকতে পারবে। তাদের সম্পদের পাহাড় আরও স্ফীত হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল তাতে দেশের সাধারণ মানুষের কী? দেশের সাধারণ মানুষ দেশি-বিদেশি বহুজাতিক পুঁজির দ্বিমুখী আক্রমণের সামনে পড়ে সর্বস্বান্ত হবে আর তার বিনিময়ে এ দেশের মালিকরা আরও ধনী আরও সম্পদশালী হবে — এতে আমজনতার উল্লাসের কী আছে? এতে দেশের বহুজাতিক পুঁজি ও তার পারিষদ রাজনৈতিক নেতা-আমলারা উল্লসিত হতে পারেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ তো এর বিরোধিতা করবেই।

এই বিরোধিতা যাতে খুব জোরালো না হয় এজন্য ওরা মিথ্যার বেসাতি খুলে বসেছে। খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ হলে দেশের কৃষক সমাজের যে কত উপকার হবে সে কথা তারস্বরে ওরা প্রচার করছে। কৃষকদরদী সেজে ওরা বলছে হিমঘরের অভাবের জন্য উৎপন্ন ফসলের ৩০ শতাংশ ও খাদ্যশস্যের ৫-৭ শতাংশ নষ্ট হয়। ফড়েদের দৌরাত্ম্যে কৃষকরা ফসলের দাম পায় না। খুচরো ব্যবসায় দেশি-বিদেশি পুঁজির ব্যাপক বিনিয়োগ হলে এই অবস্থার অবসান হবে। কৃষকরা সরাসরি ওদের কাছে ফসল বিক্রি করবে লাভজনক দামে। গ্রাম ভারতে 'নাহি রবে হিংসা অত্যাচার, নাহি রবে দারিদ্র যাতনা।'

শুনলেও হাসি পায়, কৃষক উন্নয়নের গল্প যারা পরিবেশন করছেন সেই পুঁজির মালিক ও তার দোসররা এতকাল কৃষিক্ষেত্রে কী নীতি গ্রহণ করেছেন? ওরা সার শিল্পের বিলগ্নিকরণ করেছেন। ফলে একসময়কার আড়াই টাকা কেজির ডি এ পি এখন ১৮.৬১ টাকা। সরকারি বীজ খামারগুলো তুলে দিয়ে ওরা বীজ ব্যবসা উপঢৌকন দিয়েছে দেশি-বিদেশি পুঁজিকে। ফলে সবরকম বীজের দাম বেড়েছে বহুগুণ। ওদের নীতির ফলে যে কীটনাশকের গত বছর দাম ছিল ৩৫ টাকা (২৫০ মিলি) এ বছর তার দাম ১৯২ টাকা। উদাহরণ আরও বাড়ানো যায়। এক কথায় চাষের খরচ বেড়েছে বহুগুণ। আর ফসলের দাম? যত কম বলা যায় তত ভাল। যে পাট গত বছর কৃষক বিক্রি করেছে ৪ হাজার টাকা কুইন্টাল — বাজারে এ বছর তা বিক্রি হচ্ছে ১৬০০ - ১৭০০ টাকায়। জে সি আই সহায়ক মূল্য স্থির করেছে ১৩৭০ থেকে ২০৮০ টাকা। অথচ সবাই জানেন, এক কুইন্টাল পাট উৎপাদনের খরচ আড়াই হাজার টাকা। ফলে সরকারি সহায়ক মূল্য বাস্তবে কি সহায়ক? চাষির ধান-আলু বিক্রি হচ্ছে না। সরকার নির্বিকার। এই অবস্থায় ঋণগ্রস্ত চাষি আত্মহত্যার পথ গ্রহণ করে জীবন যন্ত্রণা এড়াবার চেষ্টা করছে। সরকারি হিসাবে আড়াই লক্ষেরও বেশি কৃষক গত কয়েক বছরে এ দেশে আত্মহত্যা করেছে। কেন এই মর্মান্তিক অবস্থা? কোন নীতির ফলে এই চরম পরিণতি? কৃষক উন্নয়নের গল্প যারা পরিবেশন করছেন সেই কংগ্রেসী নেতা মন্ত্রীরা এই সামান্য প্রশ্নের জবাব দেবেন কি?

আমরা মনে করি, সত্যিই যদি সরকার কৃষকের উন্নয়ন চাইত, তাহলে চালু করত 'সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য'। লাভজনক দামে কৃষকের ফসল কেনার দায়িত্ব গ্রহণ করত সরকার এবং তা ভর্তুকি দিয়ে আমজনতার কাছে পৌঁছে দিত। খাদ্যশস্যে ব্যবসায়ীদের অনুপ্রবেশ আইন করে বন্ধ করত। কৃষককে রক্ষা করার এ ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প পথ নেই। কিন্তু সরকার সে পথে কখনই হাঁটেনি। হেঁটেছে ঠিক এর উল্টো পথে। কৃষিপণ্যের উপর ব্যবসায়ীদের সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতেই সাহায্য করেছে ওরা। ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে।

এখন ওদের এই নয়া নীতি কৃষক জীবনে কী পরিণতি ডেকে আনবে সে প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা বলা প্রয়োজন। এই নীতির পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে ওঁরা বলছেন — এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি আসবে, ফসল সংরক্ষণের সুযোগ ও পরিধি বিস্তৃত হবে, পরিষেবার উন্নতি ঘটবে। আমরাও জানি, এসব হবে। বড় মাপের খুচরো ব্যবসা চালাতে গেলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করে ওদের উপায় নেই, চাহিদা ও পরিমাণ মত কৃষিপণ্যের জন্য উন্নত বীজের ব্যবস্থাও ওদের করতে হবে। কিন্তু এর ফলে চাষির আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে এর গ্যারান্টি কি দেওয়া যায়? দেশের কৃষকদের অভিজ্ঞতা কী? মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলের কৃষকরা উন্নত তুলা বীজ বোলগার্ড দিয়ে তুলা চাষ করেছিল। ফসলও হয়েছিল প্রচুর। কিন্তু সেখানেই ভারতের সবচেয়ে বেশি চাষি ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করেছে। কেন?

আগেই আমরা দেখিয়েছি নয়া আর্থিক নীতির দৌলতে কীভাবে কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী শিল্পসামগ্রী সার, বীজ, তেল, কীটনাশক ইত্যাদির দাম বেড়েছে। খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ এই দাম কমিয়ে দেবে না বরং দাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ারই সম্ভাবনা। তাহলে আর থাকে কৃষকের লাভজনক দাম পাওয়ার বিষয়। বিদেশি পুঁজি এসে দানছত্র খুলে এ দেশের মধ্য-নিম্ন-প্রান্তিক কৃষকের কৃষিপণ্য লাভজনক দামে কিনতে শুরু করবে এটা কি বিশ্বাস করা যায়? ওদের চরিত্র সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল, তারা ভাল করেই জানেন, এটা আকাশকুসুম কল্পনা। বরং একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, ওদের সম্ভাব্য কর্মরীতি হবে এইরকম।

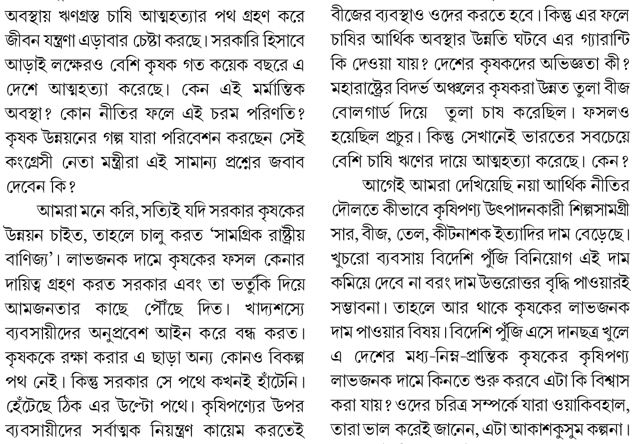

১ ডিসেম্বর দিল্লিতে বিক্ষোভ

এক, মাঠ থেকে কৃষিপণ্য বাজারজাত করার বর্তমান যে ব্যবস্থা আছে, তাকেই ওরা প্রথমে ধ্বংস করে দেবে। স্থানীয় বাজারকেন্দ্রিক ফড়ে ব্যবস্থা প্রথমে উচ্ছেদ করা হবে। অনেক ফড়ে ওদের স্থানীয় এজেন্টে পরিণত হবে। আর এই কাজে প্রথম দিকে ওরা কৃষিপণ্যের বর্তমান দামের তুলনায় একটু বেশি দামের ব্যবস্থা করবে, তারপর বিপণনের বিষয়টি করায়ত্ত করার পর স্বমূর্তি ধারণ করবে।

দুই, এই পর্যায়ে কৃষকদের উপর শর্ত আরোপ করতে শুরু করবে ওরা। ওদের বীজে, ওদের দেওয়া সার ও কীটনাশকে, ওদের প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদনে করতে হবে কৃষককে। দামও বেঁধে দেবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি। জমি কৃষকের, কিন্তু আর সবই বহুজাতিক কোম্পানির। এক ধরনের চুক্তি চাষ প্রথা চালু হবে দেশে। যে চুক্তির একদিকে অত্যন্ত শক্তিশালী বহুজাতিক কোম্পানি অন্যদিকে সহায় সম্বলহীন মধ্য-নিম্ন-প্রান্তিক কৃষক। ফল কী দাঁড়াবে তা সহজেই বোঝা যায়।

তিন, এই সমস্ত বহুজাতিক খুচরো ব্যবসায়ীদের এ দেশের কৃষিপণ্য বিক্রি করতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। প্রয়োজনে তারা বিদেশ থেকে কৃষিপণ্য এনে বিক্রি করতে পারবে। ফলে এ দেশের মধ্য-নিম্ন-প্রান্তিক কৃষককে ঠেলে দেওয়া হবে এক ভয়ঙ্কর অসম প্রতিযোগিতার দিকে। অত্যন্ত অস্থির আন্তর্জাতিক কৃষিপণ্যের বাজারে শক্তিশালী পুঁজির সাথে প্রতিযোগিতায় নেমে এদের যে হাঁড়ির হাল হবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নেই। এমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে — 'মাঠ ভর্তি ফসল, কিন্তু কেনার লোক নেই।'

চার, কেউ কেউ বলতে পারেন, এর ফলে ভালও তো হতে পারে। এ দেশের কৃষিপণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে ভাল দাম পেলে কৃষকের তো লাভ। সে গুড়েও বালি। আন্তর্জাতিক বাজারে ভাল দাম পেলেও মধ্য-নিম্ন-প্রান্তিক কৃষকের কোনও লাভ নেই। বিষয়টা বোঝার জন্য বর্তমান কৃষিপণ্যের বাজারের দিকে একটু তাকান। কৃষক আলু বিক্রি করে দেড় টাকা দু'টাকা কেজি দরে। সাধারণ মানুষ সেই আলু বাজার থেকে এমনকী বাইশ টাকা কেজি দরে কেনে। এত বিপুল টাকা কার পকেটে যায়? স্থানীয় ফড়ে ও শক্তিশালী আলু সিন্ডিকেটের মালিকদের পকেটে। খুচরো ব্যবসায়

ছয়ের পাতায় দেখুন

মগরাহাটে গুলি করে হত্যা

একের পাতার পর

জানান, পুলিশ নিয়ম অনুযায়ী শূন্যে গুলি ছোঁড়েনি। টার্গেট করে মেরেছে। একতলার খোলা ছাদে মহিলারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালানোর প্রয়োজন হল কেন? তাঁরা কি পুলিশকে আক্রমণ করতে আসছিলেন? এলাকায় গিয়ে জানা যায়, বিদ্যুতের দাবিতে বিক্ষোভ এবং ঘেরাও-এ মহিলারা বিশেষ ছিলেন না। নয় বছর বয়সী পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী রেজিনা এবং তিন সন্তানের জননী ৩২ বছরের সাহিরা বিবি, দুজনেরই শরীরের উপরের দিকে গুলি লেগে মৃত্যু হয়েছে। এরা কি পুলিশকে মারতে গিয়েছিলেন? এতিম খানার একতলা বাড়িটির দেওয়ালে এক মানুষ সমান উচ্চতায় গুলির দুটি দাগ এখনও তাজা। আর একটি গুলি বাড়িটির সামনের বারান্দার দেওয়াল ফুটো করে ঘরের ভিতরের দেওয়ালেও গর্ত করে দিয়েছে। এতিম খানার শিশুরা ঐ সময় ঘরে থাকলে তারাও নির্ঘাত মারা যেত। দুজনের মৃত্যু হলেও দেখা গেছে যেভাবে আরও কয়েকজনের গুলি লেগেছে তাতে তারাও মারা যেতে পারতেন। পায়ে গুলি, গলা ঘেঁষে গুলি, পেটে গুলির আঘাত নিয়ে কোনও রকমে বেঁচে গেছেন এরা। কেউ কেউ এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর সাথে লড়ছেন হাসপাতালে। শেখ মুস্তাক রেজিবি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'পুলিশের পায়ে ধরেছি, হাতে ধরেছি, গুলি চালাবেন না। একটা কথাও শুনল না।'

নৈনান গ্রামে গিয়ে দেখা গেল, বাসিন্দাদের বেশিরভাগই গরিব, নিম্নবিত্ত মানুষ। কোনওরকমে দিন গুজরান করেন। রেজিনার বাড়িতে ডাঃ তরুণ মণ্ডল গেলে তার বাবা চোখের জল রাখতে পারলেন না। বললেন, বড় ছেলে কিষেন মজুর খেটে নিজের পড়ার টাকা যোগাড় করে। বড় মেয়ে রেহেনাকে পড়াতে পারিনি পয়সার অভাবে।

নৈনান গ্রামে ২ ডিসেম্বর কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল

কলকাতায় ভাঙা জিনিস কুড়িয়ে বিক্রি করি, তাতেই দিন চালাই। কোনও দোষ করিনি। সন্তানহারা মা কাঁদবার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন। প্রায় শোনা যায় না এমন কণ্ঠে বললেন, 'বাচ্চা চলে গেল আমার, আমরা গরিব মানুষ, খুব কষ্ট করে মানুষ করছিলাম গো।'

এলাকায় জনপ্রিয় সাংসদকে দেখে গ্রামের মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে সকলে একযোগে বলতে লাগলেন, 'পুলিশ বলছে আমরা নাকি বোমা মেরেছি। তোমরা গ্রামের ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করো, তারা বোমার আওয়াজ শুনেছে কিনা। তারা তো মিথ্যা বলবে না। বোমার দাগ কোথাও পেয়েছো কি?'

ডাঃ তরুণ মণ্ডলকে নিহত এবং আহতদের ঘরে ঘরে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন গ্রামের মানুষ। যেখানেই তিনি গেছেন সেখানে গ্রামের মানুষ ভেঙে পড়েছে। নিহত সাহিরা বিবির স্বামী সফিক শেখ কলকাতায় চামড়ার কাজ করেন। ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তিনটি মা-হারা সন্তান নিয়ে এখন দিশেহারা। একচালা ছোট বাড়িটির দাওয়ায় বছর ছয়েকের মেয়েটিকে কোলে নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে বললেন, এখানকার রাস্তা নেই, বিদ্যুৎ নেই, খাবার জলটুকু পর্যন্ত অনেক দূরের স্কুলের মাঠ থেকে আনতে হয়। গ্রামের লোক তো লড়বেই।

গ্রামের সকলে একবাক্যে বললেন, আমরা পুলিশকে বলেছিলাম বিডিও এবং পঞ্চায়েত সভাপতি এসে কথা দিক আমাদের বিদ্যুতের লাইন দেওয়া হবে। আমাদের এখানে এখনও পর্যন্ত ১৭টার মত বিদ্যুতের খুঁটি পুঁততে হবে, কিন্তু সেই কাজ হয়নি। ২০০৭ সাল থেকে আমরা বিদ্যুতের লাইন নেব বলে আবেদন করেছি। সরকার পাল্টে গেছে, কিন্তু এখনও আমরা লাইন পেলাম না'। এক মহিলা বললেন, আমরা তো কোনও অন্যায় করিনি। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা চলছিল। পুলিশ আর বিদ্যুৎ পর্ষদের লোকজন যখন হুকিং-এর লাইন কাটতে আসে তখন গ্রামের পুরুষরা বলেছিল তোমরা ১৫ দিন সময় দাও, আমরা নিজেরাই হুকিং-এর লাইন কেটে দেব।' পুলিশ একথা মানেনি, তারা বাড়ি বাড়ি ঢুকে তল্লাশি চালায়, টিভি, লাইট, খুলে নিয়ে চলে যায়। সাহারুল মল্লিক, মোজাফ্‌ফর মোল্লা, হোসেন আলি শেখ, আবদুল হাসান মল্লিক, আবদুর রহমান মল্লিক, আহম্মদ উজ্জামান মণ্ডল সহ গ্রামের অনেক মানুষ সাংঘাতিক আহত। এদের মধ্যে যারা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তাদের বাড়িগুলিতে হাঁড়ি চড়ছে না। হোসেন আলি শেখ প্রতিবন্ধী। পুলিশের লাঠিচার্জের সময় তিনি দৌড়তে পারেননি। তাকে বেধড়ক মেরেছে পুলিশ। সাংসদের কাছে তাঁর স্ত্রী মাসুদা বিবি কাঁদতে কাঁদতে জানালেন যে, বাচ্চাদের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার সংস্থানটুকুও তাঁদের নেই। দলের পক্ষ থেকে কিছু অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় তাঁকে। সাহায্য দেওয়া হয় বন্দুকের কুঁদোয় আহত আবদুল হাসানের সংসারেও।

কোনও সরকারি সাহায্য না এলে এই মানুষগুলির চিকিৎসা বা সংসার কীভাবে চলবে এ প্রশ্ন উঠেছে। কমরেড তরুণ মণ্ডল দলের পক্ষ থেকে

৩ ডিসেম্বর নিহত রেজিনা খাতুনের পরিজনদের সাথে জয়নগরের সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল

দিনগুজরানের জন্য নিহত-আহতদের পরিজনদের হাতে ১২ হাজার টাকা তুলে দেন। সাথে সাথে এলাকার রাস্তা, জল, বিদ্যুতের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা সাংসদ তহবিল থেকে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। রাস্তার জন্য তিনি বিধায়ক তহবিল, পঞ্চায়েত এবং পি ডবলিউ ডি থেকে অর্থ বরাদ্দের দাবি তোলেন।

সিপিএম শাসনে পুলিশের ভূমিকা মানুষ ভোলেনি। কিন্তু এখন? পুলিশ বলেছে তাদের উপর চড়াও হয়েছিল গ্রামবাসীরা, বোমা মেরেছিল। যা সত্য নয়। এমনকী তাদের গুলিতে দুইজনের মৃত্যুর ঘটনাও পুলিশ প্রথমে অস্বীকার করেছে। মগরাহাটের সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলেছে, সরকার পরিবর্তনের পরে তাদের সমস্যার সমাধান এবং পুলিশের মানবিক আচরণের আশা কি তারা করতে পারেন না?

এই ঘটনার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)র পক্ষ থেকে পুলিশি আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে দাবি করা হয়েছে, গুলি চালিয়ে হত্যা ও আহত করার জন্য দোষী পুলিশের অবিলম্বে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, অবিলম্বে ঐ এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হবে, নিহতদের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা, আহতদের পরিবার পিছু ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত অতি দ্রুত সম্পন্ন করে তার রিপোর্ট জনসমক্ষে জানাতে হবে।

৪ ডিসেম্বর বনধ, অভিনন্দন জনগণকে

পুলিশের গুলিতে দু'জন মহিলার মৃত্যু এবং আরও বহু মানুষের আহত হওয়ার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি প্রথমে ৩ ডিসেম্বর মগরাহাটে ১২ ঘণ্টার বনধের আহ্বান জানায়, কিন্তু পরীক্ষা ও অন্যান্য কারণে জনগণের অনুরোধে ধর্মঘট পিছিয়ে ৪ ডিসেম্বর ডাকা হয়। এ দিন জনগণের ব্যাপক সমর্থনে ধর্মঘট সর্বাত্মক রূপ নেওয়ায় কিছু স্থানে স্বার্থান্বেষী মহল জোর করে দোকান-পাট খোলানোর চেষ্টা করলে জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

বনধ সফল করার জন্য জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান ৪ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে জনগণকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে দলমত নির্বিশেষে গণকমিটি গঠন করে এলাকার উন্নয়নের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

নৈনানে অ্যাবেকার প্রতিনিধি দল

২ ডিসেম্বর অ্যাবেকার সহসভাপতি অনুকূল ভদ্র, রাজ্য সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক দিব্যেন্দু মুখার্জী সহ এক প্রতিনিধি দল নৈনান গ্রাম ঘুরে পুলিশি অত্যাচারের নির্মমতা দেখে বলেন, কোনও স্বাধীন দেশে পুলিশ যে মানুষের উপর এমন অত্যাচার করতে পারে, তা এখানে না এলে বোঝা যেত না। এই গ্রামেরই শত শত মানুষ ২০০৭ সাল থেকে আবেদন করে আজও বিদ্যুৎ পাননি। একটি গ্রামের ১২৪ জনের একটি তালিকায় দেখা যাচ্ছে এই আবেদনকারীদের অনেকেই কোটেশনের টাকা জমা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়নি। জেনারেটর মালিকদের সঙ্গে বিদ্যুৎ দফতরের যোগসাজশ সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছে। যখন দীর্ঘদিনের বঞ্চনায় ক্ষুব্ধ মানুষ লাইন কাটার আগে তাদের আবেদন মতো বৈধ সংযোগের প্রতিশ্রুতি চাইছিল, তখন পুলিশ বাহিনী, সশস্ত্র র‍্যাফ উন্মত্তের মতো লাঠি গুলি চালিয়ে মানুষকে হত্যা করেছে।

অ্যাবেকার দাবি, আগামী ৭ দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে; ৫ বছর আগে আবেদন করা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ না দেওয়ার জন্য দোষী বিদ্যুৎ আধিকারিকদের শাস্তি দিতে হবে; নিহতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সংগঠনের পক্ষ থেকে পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ৪ ডিসেম্বর মগরাহাট ১২ ঘণ্টা বনধ এবং ৫ ডিসেম্বর সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবসে কালো ব্যাজ পরিধান করে সাপ্লাই অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়।

খুচরো ব্যবসা

পাঁচের পাতার পর

নতুন নীতি চালু হলে এই টাকা চলে যাবে বহুজাতিক কর্পোরেশনের পকেটে। বর্তমান শোষকদের তুলনায় বহুজাতিক পুঁজি অনেক শক্তিশালী হওয়ায় এই শোষণ হবে আরও মারাত্মক আরও ভয়ঙ্কর।

পাঁচ, তিন-চার ফসলি উর্বর কৃষিজমির মালিকদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবে এই সব বহুজাতিক সংস্থা। প্রথম দিকে এদের উদার হস্তে দাদন দিয়ে চুক্তিবদ্ধ করার চেষ্টা হবে। শেষ পর্যন্ত ঋণের চক্রে জড়িয়ে ফেলে ইচ্ছামতো শর্তে প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদন করিয়ে নেওয়া হবে। অন্যরূপে আর এক ধরনের নীল চাষ প্রথা কায়েম হবে এ দেশে।

ছয়, অভিজ্ঞতা বলছে যত উচ্চ ফলনশীল বীজ, তত বেশি সার-বীজ-তেল, তত বেশি জল, তত বেশি চাষের খরচ। ক্রমবর্দ্ধমান এই চাষের খরচ মেটানো মধ্য-নিম্ন-প্রান্তিক কৃষকের পক্ষে অসম্ভব। ফলে জমির কেন্দ্রীভবনের পুঁজিবাদী প্রবণতা বেগবান হবে। আর এই প্রক্রিয়া যাতে আইনি বাধার সামনে না পড়ে সে জন্য জমির ঊর্ধ্বসীমা আইনও ধীরে ধীরে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

সাত, ওদের উন্নত প্রযুক্তি খেতমজুরদের আরও কর্মহীন করবে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে ১১৪ কোটি শ্রমদিবস তৈরি হয়। অর্থাৎ এক কোটি খেতমজুর বছরে ১১৪ দিন কাজ পায়। বাকি ২৫১ দিন কর্মহীন, বেকার। এই কর্মহীন দিনের সংখ্যা আরও বাড়বে।

তাই খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী দোকানদার, দোকান কর্মচারী, মধ্য-নিম্ন-প্রান্তিক কৃষক, খেতমজুর, ক্ষুদ্র উৎপাদক — কারও লাভ নেই। বরং ক্ষতি ভয়ঙ্কর। লাভ শুধু দেশি-বিদেশি কর্পোরেট সংস্থার। তাই দেশজুড়ে প্রতিরোধের আওয়াজ উঠছে। আওয়াজ উঠছে — খুচরো ব্যবসায় দেশি-বিদেশি কোনও বহুজাতিক পুঁজিকেই ঢুকতে দেওয়া চলবে না। এই আওয়াজ দিনে দিনে আরও শক্তি সঞ্চয় করবে।

আর একটা কথাও এ প্রসঙ্গে ভেবে দেখা দরকার। বিশ্বের তাবড় তাবড় বহুজাতিক কর্পোরেশন তেল-নুন-চিনি, ধনেপাতা-লঙ্কা-লাউ-কুমড়ো-বেগুন-শসা বিক্রির দিকে নজর দিল কেন? উত্তর একটাই। ওদের উপায় নেই। শিল্পোৎপাদন তলানিতে। বাজার নেই, বিক্রি নেই, ক্রেতা নেই। রিয়েল এস্টেট ব্যবসা ধরে ওরা উঠে দাঁড়াতে চেয়েছিল। আমেরিকার অর্থনৈতিক ধস সে ফানুসও ফাটিয়ে দিয়েছে। শেয়ার বাজারে ফাটকা খেলিয়ে ওরা অলস পুঁজি কাজে লাগাতে চাইছে। জুয়াড়ি হয়ে পুঁজিবাদ বাঁচতে চাইছে। ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায়, পুঁজিবাদও তেমন এই খুচরো ব্যবসার হাত ধরে আত্মরক্ষা করতে চাইছে। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা হল — এই পথেও ওরা বাঁচতে পারবে না। ওদের ধ্বংসের দিন আগত। ধ্বংস ওদের হবেই।

(তথ্য সূত্র ঃ Discussion Paper on Foreign Direct Investment in Multi-Brand Retail Trading, Govt. of India, 3 July, 2010)

পাশ-ফেল তুলে দেওয়া চলবে না

একের পাতার পর

তারা পিছপা হয় না। শাসকেরা চিরকাল এই মনটাকে ভয় পায়, তাই নানা ভাবে তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। শাসকদের টাকায় চলা সংবাদমাধ্যম আন্দোলন, মিছিলের বিরুদ্ধে প্রচার তোলে। কিন্তু আন্দোলনের লক্ষ্য এবং নেতৃত্ব সঠিক থাকলে তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। এদিনও দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ দেখেছেন, এই মিছিল তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার দাবিতে, তাই মিছিলে না হাঁটা, ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়া মানুষও অজান্তেই সামিল হয়েছেন এই মিছিলে।

পদযাত্রার প্রারম্ভে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বক্তব্য রেখেছেন বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা এবং দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল। পুরুলিয়ার নাট্যগোষ্ঠী পরিবেশন করেছে পথনাটিকা। সেই সময় রাস্তার যানজটে আটকে থাকা ট্যাক্সির মধ্যে বসে চালক রামকৃপা কামদ বললেন, 'পাশ-ফেল তুলে দিলে গরিব ঘরে পড়াশোনাই তো উঠে যাবে। ভেবেছিলাম সরকার পাল্টালে দিন পাল্টাবে, কিছুই তো পাল্টালো না'! মহম্মদ জান স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্ররা বাড়ি যাওয়ার পথে ঢুকে গেল মিছিলের ভিড়ে। শেখ জাভেদ, মহম্মদ তারিক দুই ছাত্রের প্রশ্ন — ছাত্ররা প্রতিবাদ করবে না, তাহলে কারা করবে?

শিক্ষা সম্পর্কে মহান মনীষী রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, টলস্টয়, মহান নেতা লেনিন ও শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি এবং পদযাত্রার দাবি বহন করে চলেছে সুসজ্জিত ট্যাবলো। দাবি সম্বলিত ব্যানার, প্ল্যাকার্ড হাতে স্লোগানে মুখরিত গ্রাম্য গৃহবধূ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রীরা। পদযাত্রার পুরোভাগে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এবং অন্যান্য রাজ্য নেতৃবৃন্দ। ছিলেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু। জয়নগর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর সামিল হয়েছিলেন পদযাত্রায়।

মেডিকেল কলেজে আত্মীয়কে ভর্তি করে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন সি এস দস্তিদার। অভিভাবকদের সাথে ছাত্রদের মিছিলে হাঁটতে দেখে বললেন, 'এদেরই তো প্রতিবাদ করা উচিত। ছাত্রদের ক্ষতি হবে, আর তারা বাড়িতে বসে থাকবে, এটা হলেই ভাবতাম অন্যায় করছে।' শিক্ষকরাও মিছিলে আছেন শুনে বললেন, 'আজও তাহলে যথার্থ শিক্ষক আছেন!' পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে এসেছিলেন স্কুল শিক্ষক অসীম অধিকারী। বললেন, 'শিক্ষামন্ত্রী বলছেন, তিনি নিজে নাকি পাশ-ফেল রাখার পক্ষে। কেন্দ্রীয় নীতির জন্যই নাকি তাঁরা এটা চালু করতে বাধ্য হচ্ছেন। এ তো আত্মপ্রতারণা! যাতে ক্ষতি হবে বলে মনে করি তা ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেব কেন? তাছাড়া, কেন্দ্রের নীতি পশ্চিমবঙ্গ কবে মাথা নিচু করে মেনে নিয়েছে?' বউবাজার মোড়ের ফুল বিক্রেতা গোবিন্দ দাস, মিছিলের কারণে সাইকেল ঠেলে চলতে বাধ্য হওয়া সংবাদপত্র বিক্রেতা গণেশ মাইতি, প্রায় একই কথা দুজনের — 'পাশ-ফেল তুলে দিলে সর্বনাশ তো হবে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের, গাড়ি করে যে ঘরের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় তাদের তো কোনও ক্ষতি নেই। তাই দেখবেন এরাই মিছিলের বিরুদ্ধে কথা তুলবে। কাগজ, টিভি এদের কথাই প্রচার করবে। মরব আমরা।'এরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল এলিট সিনেমার সামনে দাঁড়ানো দোকান কর্মচারী মহঃ আবদুল্লাহর গলায়।

এসপ্ল্যানেডের মোড়ে বাইক নিয়ে যানজটে আটকে পড়া হরেন্দ্র শর্মা বললেন, 'আমি তো অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে যেতে পারতাম, কিন্তু যাইনি। আমি মনে করি প্রোটেস্ট না হলে কোনও কিছু হবে না। তাই আপনাদের মিছিল দেখছি।' গ্র্যান্ড হোটেলের ফুটপাতে বসা হকার মেহবুব আলম অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছিলেন উর্দুতে লেখা পোস্টার। দেখা পেতেই ছুটে গিয়ে লেখাগুলি পড়ছিলেন। তাঁর কথায় — 'পাশ-ফেল তুলে দিলে ছাত্ররা মেহনত করবে না। তার ফলে বিকাশ হবে না। আমাদের মতো গরিব ঘরে বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে এইট-এর পর পড়া ছেড়ে দেয়, ওরা তা হলে আর কিছুই শিখবে না।' লিন্ডসে স্ট্রিটে দেখা পাওয়া গেল চাকুরিজীবী এবং ম্যানেজমেন্টের ছাত্রী সোমা মুখার্জীর। বললেন — 'আমি এই মিছিলের পক্ষে। সরকারের এই নীতি সর্বনাশ করবে।' ভবানীপুরের কাছে দাঁড়ানো এস এফ আই-এর এক সমর্থক নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমাদের সরকার পাশ-ফেল ও ইংরেজি তুলে দিয়ে ক্ষতি করেছিল, আপনারা আন্দোলন করেছিলেন, তখন বুঝিনি। এখন দেখছি আপনাদের শক্তি আরও বেড়েছে। আমাদের দল এখন দিশাহারা।' বালিগঞ্জ স্টেশনগামী বাসে বসেছিলেন সবজি বিক্রেতা কয়েকজন মহিলা। ফিটফাট একজন বাবুশ্রেণীর লোক সবে বলেছেন, 'এত বড় মিছিল? কখন যে গাড়ি চলবে?' মহিলারা প্রায় হৈ হৈ করে উঠলেন, 'দেখছো না, গরিবের লেখাপড়া মেরে দিচ্ছে, তখন তো তোমাদের গায়ে লাগে না?' বাস জুড়ে শুরু হয়ে গেল আলোচনা। সকলের মুখে একই কথা — 'এস ইউ সি আই-এর মিছিল তো — ওরাই লড়ে, ওরাই পারবে।' মিছিল শেষে এস ইউ সি আই (সি)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু বলেন, সি পি এম সরকার প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার পর বলেছিল এটা 'সেটেলড ফ্যাক্ট', এই সিদ্ধান্তের নড়চড় হবে না। ১৯ বছর আন্দোলন করে মানুষ ইংরেজি ফিরিয়ে এনেছে। পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে বেসরকারি বৃত্তি পরীক্ষা চলছে। লক্ষ লক্ষ শিক্ষক অভিভাবক এই পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত। কোনও হুমকি, কোনও নিষেধাজ্ঞা দিয়ে তাদের আটকানো যায়নি। এই সরকার যদি একই কাজ করতে চায়, মানুষ একই ভাবে প্রতিরোধ করবে।

১ ডিসেম্বর, মিছিলে অসংখ্য মানুষ দৃপ্ত পদে হেঁটেছেন, একসঙ্গে স্লোগানে গলা মিলিয়ে বলেছেন মনুষ্যত্ব ধ্বংসকারী শিক্ষানীতি রুখছি, সর্বনাশা কেন্দ্রীয় শিক্ষা আইন এ রাজ্যে চালু করা চলবে না। এই স্লোগান অনুরণিত হয়েছে শুধু কলকাতার মানুষের বুকেই নয়, রাজ্যের আবাল বৃদ্ধ বনিতার মনের মধ্যেও। সরকার যদি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা আইনের জনবিরোধী সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার এ রাজ্যে যদি চালু করে, মানুষ প্রস্তুত, প্রতিবাদ হবে। হবে লাগাতার আন্দোলন। সে কথাই বলে গেল এই পদযাত্রা।

মিছিলে উত্তাল ম্যাঞ্চেস্টারের রাজপথ, ধর্মঘটে স্তব্ধ ব্রিটেন

দেশের বৃহত্তম ধর্মঘটে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ব্রিটেন। সামিল হলেন হাজার হাজার হাসপাতাল, স্কুল, কোর্ট, অভিবাসন দপ্তর, বিমানবন্দর প্রভৃতি নানা সরকারি দপ্তরের ২০ লক্ষ কর্মচারী। সরকারের নয়া পেনশন সংস্কার নীতির বিরুদ্ধেই ছিল এই ধর্মঘট। আমেরিকার ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে শহরে শহরে। ইউরোপ জুড়ে বয়ে চলেছে একের পর এক ধর্মঘট, আন্দোলনের ঢেউ। এ দেশে এক শ্রেণির সংবাদমাধ্যম ধর্মঘট-আন্দোলন দেখলেই তাতে কত ক্ষতি হয়েছে তার ফিরিস্তি দিতে থাকে। ওই দেশগুলিতে বোধহয় এমন 'বুদ্ধিমান' সাংবাদিক নেই। ছবি ঃ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, ১ ডিসেম্বর।

চাকরির স্থায়িত্বের অধিকার হরণের প্রতিবাদে

পার্টটাইম অধ্যাপকদের অনশন

পার্টটাইম কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন কুটাব-এর নেতৃত্বে ২১ নভেম্বর থেকে কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে লাগাতার অনশন কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। ২৪ জন এই অনশনে অংশগ্রহণ করেন যাঁদের মধ্যে চারজনকে দু'দিন পর আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগে সরকার গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলি মূলত পার্টটাইম শিক্ষকদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অথচ এই শিক্ষকরা চূড়ান্ত বঞ্চনার শিকার। তাদের ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরির স্থায়িত্বের দাবি বিগত সিপিএম সরকার বারবার উপেক্ষা করেছে। কিন্তু পার্টটাইম শিক্ষকরা আন্দোলনে অবিচল থেকেছেন। অবশেষে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শিক্ষকরা সেই দাবি অর্জন করেন। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কায়েম হওয়ার পর তাদের একটি নির্দেশ ঐ অধিকারের উপর নতুন আঘাত হেনেছে।

নতুন উচ্চশিক্ষামন্ত্রীকে কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল [কুটাব (পি টি টি)]-এর রাজ্য কমিটি স্মারকলিপি দিতে গেলে তিনি জানান আংশিক সময়ের অধ্যাপকদের জন্য একটি ভালো সরকারি নির্দেশনামা দ্রুত প্রকাশ করবেন যা পরবর্তীকালে একটি বৈদ্যুতিন চ্যানেলেও প্রচারিত হয়। কিন্তু ভালো কিছুর পরিবর্তে ২৯ সেপ্টেম্বর জারি করা সেই সার্কুলারে বলা হয় স্থায়ী হওয়া অধ্যাপকদের প্রতিবছর স্থায়িত্বকে পুনর্নবীকরণ করতে হবে। এই সার্কুলার ইতিপূর্বে স্থায়ী হওয়া শিক্ষকদের স্থায়িত্বকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। এর প্রতিবাদে কুটাব-এর নেতৃত্বে গত ৪ নভেম্বর, বিকাশভবনে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকরা অবস্থান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং ঐ কালা সার্কুলারের কপি পোড়ান। আন্দোলনের চাপে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য হন এবং প্রতি বছর অ্যাপ্রুভাল রিনিউ করতে হবে না এই আশ্বাস দেওয়া হয়। মন্ত্রীর আশ্বাস পেয়ে অবস্থান উঠে যায়। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও শিক্ষকরা লক্ষ করলেন যে, রিনিউয়াল-এর প্রক্রিয়া চলছে এবং তা বন্ধ করার কোনওরকম নির্দেশ উচ্চশিক্ষাদপ্তর দেয়নি।

শেষ পর্যন্ত অনশন আন্দোলনের চাপে ২৪ নভেম্বর সরকারের তরফ থেকে উচ্চশিক্ষা বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক অভিরূপ সরকার কুটাব-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করতে বাধ্য হন। তিনি অনশন মঞ্চে এসে শত শত শিক্ষকের সামনে ঘোষণা করেন ২০১১-'১২ শিক্ষাবর্ষের পরে আর 'অ্যাপ্রুভাল রিনিউ' করতে হবে না। তিনি আরও বলেন, কুটাব-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা না করে সরকার কোনও নির্দেশনামা জারি করবে না। এই সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পেয়ে অনশন প্রত্যাহৃত হয়। নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন, সপ্তাহে পাঁচদিনের কাজ, সমকাজে সমবেতন, গভর্নিং বডি ও টিচারস কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্বের দাবি নিয়ে তারা শক্তিশালী ও লাগাতার আন্দোলনের পথে যাবেন।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

লড়াই করেই স্বাধীনতা অর্জন করব

সর্বভারতীয় কনভেনশনে এ আই এম এস এস-এর দৃপ্ত অঙ্গীকার

পুরুষশাসিত সমাজের বঞ্চনা-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ছেন পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা, মদ-ড্রাগ-নারী পাচারের বিরুদ্ধে লড়ছেন কর্ণাটকের মহিলারা। আবার কন্যাভ্রূণ হত্যা, শিশুহত্যা ও পণপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছেন হরিয়ানা, রাজস্থানের মহিলারা। দিকে দিকে মহিলাদের এই লড়াই-আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ রূপ দিতেই বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত হল সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সর্বভারতীয় কনভেনশন। ২৯-৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে ২০টি রাজ্যের সহস্রাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। মহিলাদের এতবড় সমাবেশ বাঙ্গালোরবাসীদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কর্ণাটকের সংবাদপত্রগুলিতে কনভেনশনের খবর যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে। কনভেনশনে যোগদানকারী মহিলাদের উজ্জ্বল চোখমুখ শহরবাসীদের প্রত্যয়ী করেছে — আন্দোলন ছাড়া কোনও পথ নেই।

বাঙ্গালোর রবীন্দ্র কলাক্ষেত্রে কনভেনশনের উদ্বোধন করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এম এন ভেঙ্কটচালাইয়া। সম্মানীয় অতিথি ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি এন শ্রীকৃষ্ণ, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক গোকুলানন্দ দাস। কর্ণাটকের বিখ্যাত শিল্পী সঙ্গীতা কাট্টির সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে কনভেনশন শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন এ আই এম এস এসের গুজরাটের এ আই এম এস এস নেত্রী মীনাক্ষী যোশী প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন, এই আন্দোলন শুধুমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতের নয়, এ আমাদের সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই। কনভেনশনে উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর উদ্বোধক, কন্নড় ভাষার বিখ্যাত লেখিকা বৈদেহী দৃপ্ত কণ্ঠে মহিলাদের শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা ডঃ এইচ জি জয়লক্ষ্মী তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে কনভেনশন সফল করার জন্য সকলকে অভিনন্দন জানান। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন এ আই ডি ওয়াই ও-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড বি আর মঞ্জুনাথ।

সভাপতির ভাষণে কমরেড ছায়া মুখার্জী বলেন, একুশ শতকেও আমাদের দেশের মেয়েরা বঞ্চনা ও অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন। লড়াই করে স্বাধীনতা তাদের নিজেদেরই অর্জন করতে হবে, কেউ আদায় করে দেবে না। একটা দেশের উন্নতির মাপকাঠি নির্ভর করে সে দেশের মেয়েরা কতটা অগ্রণী, কতটা স্বাধীন তার উপর। তিনি বলেন, এরকম সমাজ আমরা গড়তে চাই যেখানে নারী পুরুষের অধিকারে কোনও ফারাক থাকবে না, শোষণ-বঞ্চনা থাকবে না। তিনি নারী স্বাধীনতার লক্ষ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের লড়াই গড়ে তোলার প্রয়োজনের কথা বলেন। কনভেনশনের স্মরণিকা প্রকাশ করে অধ্যাপক গোকুলানন্দ দাস বলেন, কর্মশালাগুলি পরিচালনা করেন। সংগঠনের সর্বভারতীয় সহসভানেত্রী কমরেড সাধনা চৌধুরী ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড় সহ সংগঠনের সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ এগুলি পরিচালনা করতে সাহায্য করেন। ধর্ষণ সংক্রান্ত অ্যাপ্রোচ পেপার পাঠ করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ কমরেড কৃষ্ণা সেন। দেশের সর্বত্র মেয়েরা কীভাবে পুরুষের বিকৃত লালসার শিকার হচ্ছেন এবং গোটা দেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার মৈপীঠে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে অংশ নেওয়া মহিলাদের মনোবল ভাঙতে ধর্ষণ, গণধর্ষণকে কীভাবে শাসকশ্রেণী ব্যবহার করেছে, এতে তা তুলে ধরা হয়। পরিচারিকাদের ধর্ষণ করে হত্যা, পণ দিতে না পারার জন্য হত্যা, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করে হত্যা প্রভৃতি নৃশংস ঘটনাও তুলে ধরেন প্রতিনিধিরা। পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা ও অপরাধীদের ধরার ক্ষেত্রে অনীহা, সমাজে প্রভাবশালী অপরাধীদের অপরাধ করেও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ানো এগুলি সম্পর্কেও তাঁরা মত দেন। অনেক ক্ষেত্রে ধর্ষিতা মহিলাদের সমাজে একঘরে হয়ে পড়ার পরিণতিতে এমনকী আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার মতো মর্মান্তিক ঘটনার কথা নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেন। মদ-জুয়া, টিভির অশ্লীল প্রোগ্রাম, স্কুলে যৌন শিক্ষা ইত্যাদির ফলেও মহিলাদের উপর অত্যাচার বেড়ে বিক্রি হয়ে যাওয়া বা পাচার হয়ে যাওয়া মেয়েরা ফিরে এলেও তাদের নিরাপদে রাখার কোনও ব্যবস্থা করে না প্রশাসন। অনাথ মেয়েদের যে সমস্ত হোমে রাখা হয় সেখান থেকেও চলে পাচার। তালাক প্রথা প্রচলিত থাকায় মুসলিম মহিলাদের অবস্থা আরও করুণ। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট থাকলেও তা কার্যকর করা হয় না। পশ্চিমবঙ্গের এক প্রতিনিধি পাচার হয়ে যাওয়া ১৯টি মেয়েকে সংগঠনের পক্ষ থেকে উদ্ধার করার ঘটনা বিবৃত করে তাদের মর্মস্পর্শী কাহিনী তুলে ধরেন, যা শুনে অনেকেই শিউরে ওঠেন। আইনের মাধ্যমে পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ করার দাবিও ওঠে।

কর্মশালাগুলি শেষ হওয়ার পর ঐ দিন রবীন্দ্র কলাক্ষেত্রের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। হল ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। বিচারপতি সুরেশ হোসবেট বলেন, 'আই অ্যাম রিটায়ার্ড, বাট নট টায়ার্ড। ভারতের যে কোনও প্রান্তে আমি ছুটে যেতে পারি'।

সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন, বিশ্বায়ন, ভোগবাদ মানুষের সামাজিক-নৈতিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নষ্ট করে দিচ্ছে। তিনি বলেন, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াতে পতিতাবৃত্তি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নারী স্বাধীনতার জন্য নারী-পুরুষ উভয়কেই একত্রে লড়তে হবে। সমাপ্তি ভাষণে কমরেড ছায়া মুখার্জী সমস্ত প্রতিনিধিদের নিজ নিজ এলাকায় ফিরে মহিলাদের উপর নির্যাতন,

কনভেনশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের একাংশ। ডানদিকে মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্টজনেরা।

সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী। বিচারপতি ভেঙ্কটচালাইয়া বলেন, উনবিংশ শতকে আমেরিকায় এক মহিলা আইনজীবী হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শুধুমাত্র মহিলা বলেই তিনি তা হতে পারেননি। কলকাতা হাইকোর্টেও রেজিনা সাহু নামে এক মহিলাকেও আইনজীবী হওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়। ভেঙ্কটচালাইয়া বলেন, সব পুরুষই নারীর সন্তান, অথচ তারা মেয়েদের অবহেলা করে। তিনি আরও বলেন, শুধুমাত্র আইন দ্বারা মহিলাদের অধিকার নিশ্চিত করা যাবে না, আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তা করতে হবে।

বিচারপতি বি এন শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মহিলাদের উপর নিপীড়নকারীদের শাস্তির কঠোরতার চেয়ে তাদের শাস্তি যাতে সুনিশ্চিত হয় সেটা দেখা বেশি প্রয়োজন। তিনি বলেন, মহিলাদের উপর পুরুষের নির্যাতনের জন্য বর্তমানের বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থাই দায়ী। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের থেকেও বেশি, যদিও অত্যাচারের সমস্ত ঘটনা নথিভুক্ত হয় না। এর বিরুদ্ধে মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রয়োজনের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, অসাম্য ছাড়া মহিলাদের হারাবার কিছুই নেই।

সংগঠনের আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা কমরেড চন্দ্রলেখা দাস মণিপুরের আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট (আফস্পা) প্রত্যাহারের দাবিতে ১৯৯১ সাল থেকে চলা শর্মিলা ইরম চানুর অনশন সমর্থন করে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কনভেনশনের ব্যাজে যে প্রতিবাদী মহিলার ছবি ছাপা হয়েছে, তেমন মহিলাই আমরা দেখতে চাই। লাঞ্ছিতা নারী কেন অসহায়ভাবে কাঁদবে? তাকে প্রতিবাদে জ্বলে উঠতে হবে। প্রতিটি সমাজব্যবস্থাতেই নারীরা কীভাবে নির্যাতিত হয়েছে সে বিষয়ে কর্ণাটকের অঙ্কুর নাট্যগোষ্ঠী নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে।

৩০ নভেম্বর প্রতিনিধি অধিবেশনে মূলত ইংরাজি ও হিন্দিতে আলোচনা হয়। উপস্থিত অনেকেই ভাষা না বুঝলেও হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন এবং মনোযোগ সহকারে শোনেন। এই অধিবেশনে ভাষার ভিত্তিতে চারটি ভাগে ভাগ করে কর্মশালা হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এগুলি পরিচালনা করেন। ধর্ষণ, গণধর্ষণ, কন্যাভ্রূণ হত্যা, শিশুহত্যা, পারিবারিক হিংসা এবং পণপ্রথা সংক্রান্ত অপরাধ, মদ ও ড্রাগের প্রভাব, ইভটিজিং, নারী ও শিশু পাচার, অনার কিলিং, ডাইনি সন্দেহে হত্যা, ক্রমবর্ধমান অপরাধমূলক কাজকর্ম নিয়ে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের হেনস্থা ইত্যাদি বিষয়ের উপর এই কর্মশালাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। সিকিম হাইকোর্টের প্রাক্তন মুখ্য বিচারক মলয় সেনগুপ্ত, মুম্বাই হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুরেশ হোসবেট, এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ এবং সংসদের স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ডাঃ তরুণ মণ্ডল, বিচারপতি সুভাষণা রেড্ডি, চিত্র পরিচালক শতরূপা সান্যাল, কর্ণাটক হাইকোর্টের বিচারপতি এম এফ সালদাহনা, ডঃ সুধা কামাথ ও অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চলেছে বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র তাঁদের নানা লেখায় তৎকালীন মেয়েদের করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন, আজকের দিনেও নারীজীবনের চিত্র এতটুকুও বদলায়নি— বলেন শতরূপা সান্যাল। বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত বলেন, আইনি অধিকার থাকা সত্ত্বেও মেয়েরা শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তিনি আরও বলেন, আর্থ-সামাজিক কারণের জন্যই বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর হওয়া সত্ত্বেও অনেক কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয় এবং বিয়ের নামে তারা বিক্রিও হয়ে যায়। অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান জানান। প্রত্যেকের চোখেমুখে ফুটে ওঠে দৃঢ় প্রত্যয়।

অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন প্রথিতযশা নৃত্যশিল্পী ডঃ মল্লিকা সারাভাই। পণপ্রথার মাধ্যমে মহিলারা কী নৃশংস অত্যাচারের শিকার হয়েছেন সেটাই ছিল নৃত্যানুষ্ঠানের বিষয়বস্তু। এ ছাড়াও ওড়িশার নৃত্যশিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। কর্ণাটকের নাট্যগোষ্ঠী নাটক পরিবেশন করে। সব মিলিয়ে এক অভূতপূর্ব কনভেনশনের সাক্ষী হয়ে রইল শহর বাঙ্গালোর।

গুজরাটে ছাত্রবিক্ষোভ

৩০ নভেম্বর আমেদাবাদ। গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমেস্টার ব্যবস্থা চালুর প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে ছাত্র বিক্ষোভ।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।